চুমু

== গুহামানব

সেদিন সকাল থেকেই আকাশ মুখ কালো করে ছিল। সকাল আটটা বাজতেই শুরু হলো বৃষ্টি। ক্যাটস অ্যান্ড ডগস যাকে বলে। সাড়ে আটটায় সফি স্যারের টিউটোরিয়াল। একবার মিস করলে পরীক্ষাটা পুনরায় নেয়ার কথা স্যারকে বলার মতো বুকের পাটা ডিপার্টমেন্টের কারো আছে বলে আমার জানা নেই। এই দুর্যোগপূর্ণ সকালে একটা ছাতা নিয়ে কলাভবনে উপস্থিত হলাম।

কলাভবনে পৌছে দেখলাম প্রতিটি রুমে তালা। আশপাশে কাউকেই দেখা যাচ্ছে না। বৃষ্টিটা একটু কমে আসার প্রত্যাশায় অপেক্ষা করতে লাগলাম। ভেজা, লেপটানো বসনে একটা মেয়ে পাশে এসে দাড়ালো। মেয়েটা আমায় লক্ষ্য করে প্রশ্ন ছুড়লো, টিউটোরিয়াল কি হবে?

প্রশ্ন শুনে বুঝলাম এ আমারই সহপাঠিনী। ক্লাসে মাথা নিচু করে বসে থাকি, ক্লাস শেষে হলে চলে আসি।

অনেক দিন আগে দাদু বলেছিলেন, তিনটি বিষয় থেকে দূরে থাকার চেষ্টা করবে – কাম, ক্রোধ আর লোভ।

দাদুর সেই উপদেশ মেনে চলার চেষ্টা করতে গিয়েই নারী থেকে আমার দূরে থাকা। নারীর প্রতিই পুরুষের বেশি লোভ, তার প্রতিই কাম। আর পুরুষের সিংহ ভাগ ক্রোধের পশ্চাতেই নারী।

মেয়েটার প্রশ্নের উত্তর দেয়ার জন্য আমার অবনত মস্তকটা একটু উচু করতেই চোখাচোখি হয়ে গেল। মস্তক সঙ্গে সঙ্গে আগের অবস্থানে ফিরে এলো। বুঝলাম বাংলা সিনেমার নায়িকাদের কেন ঘন ঘন বৃষ্টিতে ভেজানো হয়।

তুমি ছাড়া আর কেউ আসেনি? মেয়েটা চুল ঝাড়তে ঝাড়তে জানতে চাইলো।

আমি ডানে বামে মাথা ঝাকালাম।

আসার সময় হঠাৎ ছাতাটা উড়ে গিয়ে লেকে পড়লো। তারপর একেবারে চুপসে গেছি। তুমি কি আমায় হল পর্যন্ত এগিয়ে দেবে?

ভাগ্যিস মাথাটা ছিল। সেটাই বাম পাশে কাত করলাম যার অর্থ পৌছে দেবো।

আমার ছাতাটা এমনিতেই ছোট। কাম, ক্রোধ আর লোভের বিশাল কম্বিনেশনটাকে এই ছোট ছাতার নিচে ঠাই দেয়ার খুব একটা ইচ্ছা আমার ছিল না। তারপরেও তারুণ্য। দুইজনে এক ছাতার নিচে জাহানারা ইমাম হলের দিকে রওনা দিলাম।

তুমি মেয়েদের সঙ্গে কথা বলো না কেন?

এ প্রশ্নের উত্তর দেয়ার ক্ষেত্রে মাথা আর হেল্প করলো না। চুপ করে রইলাম।

মেয়েরা বাঘ বা ভাল্লুক নয়। তোমারই বন্ধু। শারীরিক গঠনটা একটু আলাদা এই যা। তুমি খুব লাজুক। লজ্জা কাটানোর জন্য এখন আমায় একটা চুমু খেতে পারো আমি কিছু মনে করবো না।

আমি অবনত মস্তক তুলতে গেলাম। দৃষ্টিটা ঠোট বা কপোল পর্যন্ত পৌছাতে পারলো না। কিছুক্ষণের নীরব হাটা শেষে হলের গেটে পৌছালাম। মেয়েটা ভেতরে ঢুকে গেল। আমি ছাতা বন্ধ করে বৃষ্টিতে ভিজতে ভিজতে আমার হলের দিকে রওনা দিলাম। বৃষ্টির ফোটা ছুয়ে যেতে লাগলো আমার ঠোট, চিবুক...।

মনের মধ্যে রাজনৈতিক দলগুলোর মতো দুটো গ্রুপ তৈরি হয়ে গেল। এক গ্রুপ আমার সংযমের প্রশংসায় পঞ্চমুখ, অন্য গ্রুপ চুমু খাবার এমন সহজতম সুযোগটা হেলায় হারানোর ভর্ৎসনায় মুখর।

জাহাঙ্গীরনগর ইউনিভার্সিটি থেকে

স্বর্গীয় আশীর্বাদ

= = কাজল

অনেক দিন হলো আমরা এই বাসাতে আছি। দুই তলা বাড়ি। দক্ষিণ জানালা বরাবর বারান্দা পেরিয়ে বড় কালো গেট। উপর তলা কিছুদিন হলো খালি হয়েছে। একদিন দেখলাম এক পরিবার মালামাল উপরে উঠাচ্ছে। শুনলাম নতুন ভাড়াটে এসেছে।

সামনে ইয়ার ফাইনাল পরীক্ষা। তাই পড়াশোনার চাপটা একটু বেশি। সকালে ঘুম থেকে উঠে হাত মুখ ধুয়ে পড়তে বসবো এমন সময় জানালার পর্দা সরাতেই মনের বন্দরে একটা ঢেউ বয়ে গেল। একি! স্বর্গের অপ্সরী মৃদু পায়ে হেটে কালো গেট পেরিয়ে গেল। হাতে ব্যাগ, গায়ে সুবিন্যস্ত ইউনিফর্ম। চোখের পলক সরাতেই দৃষ্টির বাইরে চলে গেল।

কে এই চৈত্রের এক ফোটা বৃষ্টি? আমার দৈনন্দিন জীবনে এ আর একটি অধ্যায় যোগ হলো। কখন সে কলেজে যায় আসে, তাকে এক পলক দেখার প্রত্যাশা প্রতিদিনের কাজের প্রথম অধ্যায়ে চলে এলো। ঘুমের রাজ্যে এখন একজনই স্বপ্নরানী।

মা একদিন হঠাৎ বললেন, জানিস কাজল, শ্রাবন্তীর মা খুব ভালো। মেয়েটাও হয়েছে মায়ের মতো।

শ্রাবন্তীটা আবার কে?

এই যে, উপরে যিনি নতুন এসেছেন ওনার মেয়ে, কলেজে পড়ে।

তুমিই তাহলে শ্রাবন্তী! আমার স্বপ্নাকাশের এখন একমাত্র নক্ষত্র। পরীক্ষা চলছিল। আমাদের বাসায় দুটো ছাতা। অফিসের জরুরি কাজে আব্বু একটা ছাতা নিয়ে খুব ভোরে বের হয়েছেন।

নোটগুলো চোখ বুলিয়ে রেডি হয়ে সকালে ইউনিভার্সিটির উদ্দেশ্যে বের হওয়ার প্রস্তুতি নিচ্ছি। এমন সময় বাইরে প্রচণ্ড বেগে বৃষ্টি শুরু হলো। আম্মুকে বললাম, ছাতা দাও। আম্মু অনেক খোজাখুজি করে অন্য ছাতাটির সন্ধান করতে পারলেন না। আম্মু বললেন, উপরে গিয়ে শ্রাবন্তীর মাকে বল, থাকলে না করবে না।

বাইরে এমন বৃষ্টি যে ছাতা ছাড়া বের হলে ট্যাকসি ঠিক করতে করতেই শ্রাবণের মেঘে গোসল সারতে হবে। বাধ্য হয়েই শ্রাবন্তীর বাসায় যেতে হলো। মনের ভেতরে এক রকমের ঝড় নিয়েই কলিংবেল বাজালাম।

ভেতর থেকে দরজা খুলতেই দেখি শ্রাবন্তী।

হকচকিয়ে গেলাম। নিজেকে সামলে নিয়ে বললাম, খালাম্মা আছেন?

আম্মু বাসায় নেই, ভাইয়া, কিছু বলবেন?

না মানে, ইউনিভার্সিটি যাবো, বাইরে প্রচণ্ড বৃষ্টি। বাসার ছাতাটা খুজে পাচ্ছি না। তোমাদের একটা ছাতা হবে?

ও তাই? এই বলে শ্রাবন্তী ভেতরে গেল এবং একটা ছাতা নিয়ে এলো।

তাকে ধন্যবাদ দিয়ে ছাতা নিয়ে চলে এলাম। কলেজে যেতে–আসতে এই ছাতাটি অনেক দিন শ্রাবন্তীর হাতে দেখেছি। শ্রাবন্তীর প্রতিচ্ছবি দেখতে পাচ্ছি ছাতার প্রতিটি কারুকাজে। মনে হচ্ছে শ্রাবন্তী আমাকে আড়াল করে রেখেছে বৃষ্টির পাগলামি থেকে। শ্রাবন্তীর ঘ্রাণ পাই ছাতার প্রতিটি পরতে পরতে। ইউনিভার্সিটি থেকে এসে মনে এক প্রকারের তোলপাড় নিয়ে ছাতাটা ফেরত দিতে যাই। একি! আবার শ্রাবন্তী।

ছাতাটা ফেরত দিতে এলাম।

ও তাই বুঝি?

আমার হাতের মধ্যে সে একটা চিরকুট ধরিয়ে দিয়ে বললো, বাসায় নিয়ে খুলবেন।

তাড়াতাড়ি বাসায় ফিরে খুলে দেখি, *আপনি এতো লাজুক কেন? তবুও আপনাকে আমার খুব ভালো লাগে। বিকেলে ছাদে আসবেন।*

আজ যখন যায়যায়দিনকে লেখাটি পাঠাবো বলে লিখছি তখন শ্রাবন্তী আমার পাশে বসা, ছয় মাসের সুখের সংসার আমাদের।

বনানী থেকে

টাকা

== সৈয়দ রাফি তানয়ীম

আমার নানাভাই রাজশাহী ইউনিভার্সিটির একজন প্রবীণ শিক্ষক। রাস্তায় চলাফেরার সুবিধার জন্য ও রোদ বৃষ্টি থেকে রক্ষা পাওয়ার লক্ষ্যে তিনি সব সময়ই লম্বা বাটযুক্ত একটা ছাতা ব্যবহার করেন।

বছর কয়েক আগের ঘটনা। নানাভাই শারীরিকভাবে খুব অসুস্থ এবং বাড়ি তৈরির কাজে খুব ব্যস্ত। এ রকমই একদিন তিনি ইউনিভার্সিটির অগ্রণী ব্যাংকে টাকা তুলতে গেছেন। টাকা নিয়ে তিনি প্যান্ট বা শার্টের পকেটে না রেখে ভুলে ছাতার মধ্যে রেখে দেন।

ব্যাংক থেকে বের হয়ে যথারীতি নানাভাই রোদ থেকে রক্ষার জন্য যেই ছাতা খুলেছেন সেই ছাতার মধ্য থেকে পাচশ টাকার বেশ কিছু নোট চারদিকে ছড়িয়ে-ছিটিয়ে পড়ে যায়। দৃশ্যটি দেখে ফেলেন ইউনিভার্সিটির অন্য একজন শিক্ষক। ঘটনা দেখে তিনি খুব মজা পান।

তিনি এখনো প্রায়ই রসিকতা করে আমার আব্বুকে বলেন, আপনার শ্বশুরের কতো টাকা! প্যান্টের পকেটে, শার্টের পকেটে টাকা রাখার জায়গা হয় না। তাই ছাতার মধ্যেও টাকা রাখেন।

প্রায়ই আম্মু যখন এই গল্পটি বলেন, তখন আমার খুব হাসি পায়।

রাজশাহী ইউনিভার্সিটি থেকে

রঙধনু

নার্গিস মোর্শেদা রোজী

বেনীআসহকলা সাতটি রঙের সমাহার অদ্ভুত সুন্দর ছাতাটি। বড় আপা আমেরিকা থেকে পাঠিয়েছিলেন। তখন আমার বয়স কতো হবে। তেরো কি চোদ্দ। আমি ছাতাটির নাম দিয়েছিলাম রঙধনু। কিন্তু দীর্ঘ দিনের এ লালিত ছাতাটি এখন পর্যন্ত দেখে বোঝার উপায় নেই এটি একটি পুরনো ছাতা। এ ছাতার সঙ্গে আমার প্রেম আটকে থাকা চুম্বকের মতো। স্কুল-কলেজ, ইউনিভার্সিটি পেরিয়ে চাকরি ক্ষেত্রেও এ ছাতার অবদান অনস্বীকার্য। জীবন চলার পথে অনেক কিছুরই পরিবর্তন ঘটেছে। শুধু পরিবর্তন ঘটেনি আমার এ প্রিয় ছাতাটির।

কয়েক মাস আগে খুব দরকারি একটি কাজে প্রচণ্ড বৃষ্টির মাঝে চেপে বসলাম রিকশায়। সঙ্গে আমার প্রাণপ্রিয় ছাতাটি। কাজ শেষে বাসায় ফিরে দুই এক মিনিট পর মনে হলো ছাতা ফেলে এসেছি সম্ভবত রিকশায়। বেরিয়ে পড়লাম রাস্তায়। এগিয়ে গেলাম বেশ কিছু দূর কারমাইকেল কলেজ রোড পর্যন্ত। কিন্তু ততোক্ষণে রিকশা হাওয়া। কি আর করা। বাসায় এসে বাচ্চাদের মতো করে কাদলাম কিছুক্ষণ। সবচেয়ে বড় কথা দীর্ঘ দিনের লালিত এ ছাতাটির সঙ্গে মিশে আছে আমার জীবনের অনেক স্মৃতি।

বসে বসে ছাতাটির স্মৃতি রোমন্থন করছি এমন সময় কলিংবেল বেজে উঠলো। দরজা খুলেই চমকে গেলাম। হ্যান্ডসাম এক যুবক আমার সেই সাত রঙা ছাতাটি মেলে ধরলেন আমার সামনে। খুশিতে চিৎকার করে বললাম, সত্যিই সম্ভব, আমার ভালোবাসার রঙধনু হারাতে পারে না। খুশিতে আত্মহারা হয়ে তাকে চায়ের অফার দিলাম। আমি নেমে পড়ার পর পরই রিকশায় চেপে কিছুদূর গিয়ে পায়ের কাছে পড়ে থাকা ছাতাটি অনুভব করেন ডা. ভদ্রলোক। তারপর রিকশাচালকের কাছে জেনে নেন ঠিকানা। মফস্বল শহর রংপুর, খুব ছোট্ট জায়গা।

সেই ছাতার সুবাদে ডা. ভদ্রলোকের সঙ্গে দেখা হলে অন্তত কৃতজ্ঞতার সঙ্গে কুশল বিনিময় করতে ভুলতাম না। এভাবে এক সময় ডা. ভদ্রলোক রঙধনুর উছিলায় আমার প্রেমে পড়ে যাবেন ভাবিনি। ঠিক এমনি বৃষ্টির কোনো এক সকালে একগোছা রজনীগন্ধা ও খুব সুন্দর ছাতার স্কেচ করা একটি প্রেমপত্র নিয়ে উপস্থিত হন আমার বাসায়। উপহারগুলো আমার দিকে বাড়িয়ে দিতেই আমার পাচ বছরের মেয়ে তুলতুল বললো, আম্মু কষ্ট পেয়ো না, তোমার রঙধনু আজ আব্বু আবার ফেলে এসেছে।

মুহূর্তেই ডা. ভদ্রলোকের হাত থেকে পড়ে গেল উপহারগুলো। নির্বাক হয়ে কিছুক্ষণ...। তারপর নিজকে সামলে নিয়ে বলে উঠলেন সরি! সরি! আপনি বিবাহিতা...। এতোটুকু বোঝার উপায় নেই। এখনো এতো...? তৎক্ষণাৎ ভদ্রলোক রজনীগন্ধার গোছাটি গুজে দিল তুলতুলের হাতে। তারপর তার কপালে চুমু দিয়ে *ফুলের মতো সুন্দর তুমি* বলে চলে গেল।

নির্বাক দৃষ্টিতে শুধু চেয়ে চেয়ে দেখলাম তার চলে যাওয়া।

কিন্তু আমার বুকের ক্ষত তো ক্ষতই রয়ে গেল। হারানো সেই প্রিয় ছাতাটি ফিরে পেয়ে আবারও হারালাম। এরপর তুলতুলের বাবা একটি ছাতার বিনিময়ে আমাকে তিন তিনটি ছাতা কিনে দিয়েছে। কিন্তু কৈশোরের সেই আনন্দ, দুঃখ, বেদনায় জড়ানো রঙধনু ছাতাটি মাঝে মাঝে সব রঙ ছাপিয়ে বেদনার নীল রঙ হয়ে কষ্ট দেয় আমাকে। আজো আমি অপেক্ষায় আছি রঙধনু ছাতাটির জন্য।

গোলাপি

তারিকুল ইসলাম শামমি

চট্টগ্রাম ইউনিভার্সিটিতে বাস সার্ভিস বন্ধ হয়ে যাবার পর প্রচণ্ড রোদে হেটে হেটেই ছাত্র ছাত্রীদের ফ্যাকাল্টিতে পৌছাতে হয়। ইউনিভার্সিটিতে সারা বছরই এ জন্য ছাতার আধিক্য দেখা যায়। বিশেষত মেয়েরা তো ছাতা ছাড়া চলতেই পারে না।

এই সুবিশাল ক্যাম্পাসে হাজারো ছাত্রছাত্রীর ভিড়ে লোপাকে খুজে পাওয়া বেশ কষ্টকর ব্যাপারই বটে। কিন্তু ছাতার কল্যাণে সেটা একেবারে সহজসাধ্য হয়ে গেছে। আগে কালো ছাতার চলন ছিল বেশি। এখন বেশ রঙচঙে বাহারি ছাতা বের হয়েছে। লোপার মাথার ওপরে যে সৌভাগ্যবান ছাতাটি তাকে সব সময় ছায়া দিয়ে আগলে রাখে তার রঙ গোলাপি। একেবারে আনকমন ছাতা। তাই তো ক্যাম্পাসে গোলাপি ছাতা দেখা মানেই ভেতরের মানুষটি লোপা। গোলাপি ছাতা দেখা মানেই বুকের ভেতরটা ধড়াস করে উঠা। টোয়েন্টি নাইন খেলায় গোলাম পেলে যেমন আনন্দ হয়, সিগারেটের শেষ টানটা দিতে যেমন সুখানুভূতি হয়, গোলাপি ছাতার ভেতরের মানুষটিকে দেখলে আমার একই অনুভূতি হয়।

গোলাপি ছাতার মালিকের সঙ্গে আমার কথা হয়েছে মাত্র একবার। তাতেই অবস্থা একেবারে কেরোসিন। কাউকে দেখলে যে দেহের রক্ত চলাচল বন্ধ হয়ে যেতে পারে সেদিন অনুভব করলাম। কোনো কথাই মাথায় আসে না। ভয়ানক অবস্থা। চুপচাপ বসে আছি। এদিকে অধিক গরমে আমার একেবারে কাতর অবস্থা। ঘামে গোসল করে ফেলেছি। এক ঘণ্টা বসেছিলাম অথচ কথা বললাম মাত্র ছয় সাতটা। এর মাঝে দুই একটা আবার অসংলগ্ন। সে চা খায় না শুনে বেকুবের মতো বলে বসলাম, কফি খাবে? অথচ ক্যাম্পাসে কফি পাওয়া যায় না। সে যদি খেতে চাইতো তাহলে কি করতাম কে জানে।

পরদিন থেকে শুরু হলো জ্বর। তিন দিন ভুগলাম। ভালো হওয়ার পর আরেক অদ্ভুত অসুখ দেখা দিল। অসুখটা হচ্ছে ঝিমুনি। রানীক্ষেত রোগাক্রান্ত মোরগের মতো আমি কেবলই ঝিমাই। লোপাকে বড়ই ডেঞ্জারাস মেয়ে বলে মনে হলো।

পরীক্ষা শেষ। ঝিমুনি রোগটা কমার নামগন্ধ নেই। ১৫ দিন ছুটি পেয়েছি। কিছুই ভালো লাগে না। ইতিমধ্যে লোপার ফোন নাম্বার যোগাড় করেছি। একদিন সাহস করে ফোন করে ফেললাম। এক

মোটা কণ্ঠের মহিলা ধরলো। লোপার কণ্ঠ তো এতো মোটা নয়। মিষ্টি চিকন কণ্ঠ তার। এটা বোধহয় লোপার মা। রিসিভার রেখে দিলাম। আবার করলাম। এবারও সেই মোটা কণ্ঠ। কিছুক্ষণ পর আবারও করলাম। ওপাশ থেকে এবার মোটা কণ্ঠে ভেসে এলো, *কুত্তার বাচ্চা, ফাজলামি করার জায়গা পাও না?* আরেকটু হলে আমার ছোটখাটো একটা স্ট্রোক হয়ে যেতো।

এরপর বহুদিন ফোন করি না। দুঃসাহস নিয়ে আরেকদিন করলাম। এক মোটা কণ্ঠের মহিলা বলে উঠলো, হ্যালো। ত্বরিত গতিতে রিসিভার রাখলাম। আবার কোন ইতরপ্রাণীর বাচ্চা বলে গাল দেবে কে জানে? কিন্নর কণ্ঠের মেয়ের মায়ের গলা এতো মোটা কেন?

সেদিন ছিল ইউনিভার্সিটির উৎসবের দিন। লোপাকে দেখলাম। গোলাপি ছাতার নিচে যেন হলদে পরী দাড়িয়ে আছে। খুব কাছেই ছিলাম আমি। হলদে পরীর দিকে বেশিক্ষণ তাকালে জন্ডিস হয়ে যেতে পারে এই ভয়ে আর তাকালাম না। চারদিকে রঙ মারামারি চলছিল। আজ উৎসবের দিনে সবাই যেন সবার পরিচিত। যে যাকে পারছে তাকে রঙ লাগিয়ে দিচ্ছে।

আমি রঙ বাচিয়ে কোনোমতে এগোচ্ছি। চিনি না, জানি না, এক মেয়ে হঠাৎ আমাকে চড় মেরে রঙ লাগিয়ে দিল। একটা মেয়ে যদি একটা ছেলেকে রঙ লাগিয়ে দিতে পারে তাহলে আমি পারবো না কেন? আমি এবং কায়সার রঙ নিয়ে লোপার আশপাশে ঘুর ঘুর করতে লাগলাম। শেষ পর্যন্ত সাহসে কুলালো না। হঠাৎ দেখি এক সুদর্শন ছেলে এসে লোপাকে রঙ লাগিয়ে দিল। বুঝতে পারলাম ছেলেটি লোপার পরিচিত। মনটা একটুখানি খারাপ হয়ে গেল।

কনসার্টের একটু আগে দুপুর তিনটার দিকে বৃষ্টি নামলো। আমরা বৃষ্টিতে ভিজছি। হঠাৎ রাস্তায় গোলাপি ছাতার দিকে দৃষ্টি নিবদ্ধ হলো। ছাতার নিচে দুইজন উচ্ছল হাসিতে ভেঙে পড়ছে এবং হাটছে। লোপা আর সেই ছেলেটি। সমস্ত উৎসবের আনন্দ মুহূর্তেই বিষাদে পরিণত হলো।

এখানেই শেষ নয়। তার দুই দিন পর শাটল ট্রেন থেকে নামার সময় অকস্মাৎ মুখোমুখি হলে সে যখন বান্ধবীর পেছনে লুকিয়ে আমাকে এড়িয়ে গেল তখন পুরো পৃথিবীটাকে ভীষণ পর বলে মনে হলো। অথচ দেখা হলে এমন কিছু ক্ষতি হতো না। কেমন আছোটুকু বলা ছাড়া আর কিইবা বলতে পারতাম। কষ্টগুলো সব মনের ভেতর ঘুরপাক খেয়ে মনেই পড়ে থাকে। কাউকে বলাও যায় না। শরীরের ওজন কমে যায়। কিন্তু মনের ওজন যেন বাড়তে থাকে। সমস্তটা জুড়ে কেবল কষ্ট আর কষ্ট।

দীর্ঘ এক মাস পর আবার ইউনিভার্সিটি খুলেছে। ক্যাম্পাসে যেতে ইচ্ছা করে না। এবার নাকি পার্সেন্টেজ নিয়ে বেশ কড়াকড়ি। ইচ্ছা না থাকলেও যেতে হয়। চুপচাপ ক্লাস করে চলে আসি। ভুলেও এদিক সেদিক তাকাই না পাছে আবার গোলাপি ছাতা নজরে পড়ে যায়। এরপরও অনিচ্ছাকৃতভাবে

মাঝে মাঝে গোলাপি ছাতার নিচে দৃষ্টি আটকে যায়। দীর্ঘশ্বাস ফেলে ভাবি, এই গোলাপি ছাতার নিচে কোনোদিনও আমার স্থান হবে না।

চট্টগ্রাম ইউনিভার্সিটি থেকে

৩১ বছর পর

এসএম সফিউল্লাহ

মানুষের জীবনে কতো স্মৃতিই না থাকে। বাল্যস্মৃতি তো রীতিমতো হিরন্ময়। ইদানীং আমার যেন কি হয়েছে। সব কিছু ভুলে যাই। অনেক সময় কাছের আত্মীয়, বন্ধু-বান্ধব ও কলিগদের নামও ভুলে যাই। কিন্তু যে জিনিসটা ভুলি না তা হলো বাল্যস্মৃতি। আমার বাল্যস্মৃতির অফুরন্ত ভাণ্ডারের অন্যতম স্মৃতি একটি ছাতাকে ঘিরে।

প্রতিনিয়ত প্রাকৃতিক দুর্যোগ মোকাবেলা করে বরিশালের মানুষের হতদরিদ্র দশা হয়েছে। এমন এক কঠিন বাস্তবতার এই জেলার এক গণ্ডগ্রামের স্কুলে আমার হাতেখড়ি হয়। মনে আছে প্রথম স্কুলে যাওয়ার দিনের কথা। মা খুব করে গোসল করিয়ে এক সেট নতুন কাপড় পরিয়ে আব্বার হাতে আমাকে ধরিয়ে দিলেন। তারপর তার কোলে চড়ে স্কুলে গেলাম। ছেলেবেলায় সেই স্কুলে যাওয়ার সময় আব্বা আমাকে খুব তদারকি করতেন। ভালো পোশাক আশাকের পাশাপাশি আমাকে একটি স্কুল ব্যাগ ও ছাতা কিনে দিয়েছিলেন আব্বা। আমিই ছিলাম স্কুলের একমাত্র ছাত্রটি যার হাতে শোভা পেতো স্কুল ব্যাগ ও ছাতা।

স্কুল জীবনের সেই ঊষালগ্নে ব্যাগের আবেদন অবশ্যই ছিল। কিন্তু বেশি আনন্দিত ছিলাম ছাতাটি পেয়ে। বিশেষ করে বর্ষাকালে স্কুলে এটির উপযোগিতা বেড়ে যেতো বহুগুণে। অধিকাংশ ছাত্রছাত্রী বৃষ্টির সময় হয় ভিজে যেতো, না হয় রাস্তার ধারের কলা পাতা কিংবা বড় বড় মানকচুর পাতা মাথায় দিয়ে বৃষ্টির কবল থেকে আত্মরক্ষার চেষ্টা করতো। এমন এক পরিস্থিতিতে আমার ছোট এবং বাহারী ছাতাটি আমাকে এক বিশেষ মর্যাদায় নিয়ে যেতো। অনেক সহপাঠী আমার সঙ্গে খাতির জমাতো, বিশেষত বর্ষার দিনে আমার সহযাত্রী হওয়ার জন্য। অবশ্য অধিকাংশ সময়েই আমার সহযাত্রী হতো চাচাতো ভাই নজরুল এবং তার অনুপস্থিতিতে ভাতিজা শাহ আলম। আমরা একই ক্লাসের ছাত্র ছিলাম। আমার পোশাক আশাকের পরিচর্চার পাশাপাশি আমার আকর্ষণীয় ছোট ছাতাটির কদর করতে ভুলিনি কখনো। কাপড় পুরনো হয়ে যাওয়ায় একবার ছাতটির কাপড় পরিবর্তন করা হয়েছিল। কিন্তু আমি এই প্রিয় ছাতাটির শেষ রক্ষা করতে পারিনি।

তখন ১৯৭১ সাল। আমি ক্লাস ফোরের ছাত্র। প্রথম সাময়িক পরীক্ষা শেষে ঢিমেতালে ক্লাস চলছে, প্রকৃতিও বৈরী। চারদিকে মেঘমেদুর আবহাওয়া। বৈরী প্রকৃতির সঙ্গে তাল মিলিয়ে পাক হানাদারেরা বিষাক্ত সাপের মতো ছোবল দিচ্ছিল এ দেশের মানুষকে। এসব দুঃসহ স্মৃতি আজো মানসপটে ভেসে বেড়ায়। যুদ্ধের ডামাডোলে সকল শিক্ষা প্রতিষ্ঠান বন্ধ হয়ে গেছে। বাড়ির পাশ দিয়ে প্রবাহিত আড়িয়াল খা–র শাখা নদী সন্ধ্যার বুক চিরে শত্রু সেনাদের গানবোটের আনাগোনা গোটা গ্রামবাসীকে আতঙ্কে ফেলে দিল। সম্ভাব্য আক্রমণের আশঙ্কায় গ্রামবাসী যে যার মতো পালিয়ে আত্মরক্ষার কাজে ব্যস্ত।

গ্রামের নিবেদিত প্রাণ দেশপ্রেমিক মুক্তিযোদ্ধারা তখন হানাদারদের বিরুদ্ধে গেরিলা হামলা চালাচ্ছিল। আমার চাচা সাবেক ইপিআর সদস্য প্রয়াত মালেক সরদার বীর মুক্তিযোদ্ধা ছিলেন। তখন মুক্তিযোদ্ধাদের বাড়ি–ঘর টার্গেট করে জালিয়ে দিতো হানাদারেরা। তাই সম্ভাব্য আক্রমণের ভয়ে বাড়ি–ঘর ছেড়ে ঘাটের মাঝি ওয়াজেদের নৌকা করে মা, আমি ছোট দুই বোন মাহমুদা ও খালেদা এবং অনুজ শহীদসহ আরো কয়েকজনকে নিয়ে আব্বা রওনা হলেন নিরাপদ আশ্রয়ে। বাড়ি–ঘর ও মূল্যবান সব জিনিসপত্র ফেলে রেখে শুধু জান বাচানোর জন্য সকলে ছুটলেও আমার অমূল্য প্রিয় ছাতাটি নিতে আমি ভুলিনি একদম।

নৌকা চলছে পাক হানাদারদের গানবোটের দৃষ্টি এড়িয়ে। সেদিন আবহাওয়া ভালো ছিল না। সম্ভবত মে মাস, বাংলায় বৈশাখ। রোদ বৃষ্টির লুকোচুরি খেলার মাঝে দমকা হাওয়ার তালে নৌকাও দোল খাচ্ছিল। শিশুমন বিপদ আচ করতে পারেনি। তাই প্রিয় ছাতাটি নিয়ে নৌকার গলুইতে গিয়ে বসে ছাতাটি মাথার ওপর মেলে ধরলাম। চোখের পলকে পাকসেনাদের গানবোট চলে এলো এবং শুরু হলো এলোপাতাড়ি গুলি। ঘটনার আকস্মিকতায় প্রচণ্ড ভয় পেয়ে কখন যে ছাতার বাট থেকে হাত ছুটে গেল জানি না। কিছু বুঝে ওঠার আগেই দমকা হাওয়ায় আমার পরম প্রিয় ছাতাটি উড়িয়ে নদীতে ভাসিয়ে দিল। গুলির ভয়ে আমি চিৎকার করতে পারিনি ছাতাটি পাওয়ার জন্য।

সেদিনের অবুঝ শিশুর অবচেতন মন প্রিয় ছাতাটি হারানোর জন্য বোবা কান্না কেদেছিল, কেউ শুনতে পায়নি। কিন্তু আব্বা আমার মনের অবস্থা বুঝে এই বলে সান্ত্বনা দিলো যে, হানাদারদের কবল থেকে বেচে গেলে একটি ভালো ছাতা কিনে দেবেন এবং পরে কিনেও দিয়েছিলেন।

ঢাকা থেকে

সমুদ্র

তৌহিদ

ভদ্রলোক অনেকটা ঝোকের মাথায় ছাতাটা কিনেছিলেন। একটা বাংলাদেশি দোকানে বেড়াতে আসায় ভদ্রতার খাতিরেই কেনা। অবশ্য দোকানদার বাঙালি ভদ্রমহিলা তাকে আশ্বস্ত করলেন, পছন্দ না হলে ফেরত দিয়ে যেতে পারবেন।

যদিও ছাতাটা তার পছন্দ হয়নি তবুও তিনি ফেরত দিলেন না। বরং ভদ্রমহিলাকে বলেই ফেললেন, ছাতাটা সুন্দর, অনেকটা আপনার মতো।

ভদ্রমহিলা মজাটা আরো বাড়িয়ে বললেন, তাহলে আমাকেই ছাতা হিসেবে কিনে নিয়ে যান।

সেই যে ছাতা দিয়ে শুরু, এরপর অনেক বছর...।

ভদ্রমহিলা আসলেই ভদ্রলোকের ছাতার মতোই সারা জীবন ছিলেন। ওনারা বিয়েটা করেছেন ইওরোপেই। কিন্তু ছেলেমেয়ে দুজনকে নিয়ে দেশেই সেটলড হলেন এবং তাদের স্মৃতির সেই ছাতাটি ভদ্রমহিলা রাখেন সযত্নে সব সময়। মা মানে সেই ভদ্রমহিলার একমাত্র ছেলে এই আমি তৌহিদ শরীফ রবিন। মা-তো একদিন ঠাস করে আমাকে চড়ই দিয়ে বসলেন সেই ছাতা নিয়ে স্কুলে যাবার বায়না ধরেছিলাম বলে।

বাবা কিছু বলতেন না, হাসতেন। মা কোথাও শপিং করতে বের হলে আমি, বাবা এবং রিফাত (বড়আপু) সেই ছাতা নিয়ে সোজা চলে যেতাম বিচে। তিনজনে জড়সড়ো হয়ে এক ছাতার নিচে বসে, তাকিয়ে থাকতাম দূরে সেই সমুদ্রের শেষে। মা ছাতাটা ধরতে দিতেন না বলেই ছাতাটার প্রতি আমাদের দুর্বলতা একটু বেশিই ছিল।

বাবা দেশের বাইরে গেলে মাকে সেই ছাতা বুকে নিয়ে সারা রাত পার করে দিতেও দেখেছি। মা বলতেন, এই ছাতাতেই আমরা বেধে আছি সবাই। বাবা অবশ্য এই সামান্য ছাতাকে আমল করতেন না। শুধু মাকে রাগানোর জন্যই ছাতাটা মাঝে মাঝে আমার ড্রয়ারে লুকিয়ে রাখতেন এবং এরপর বাবা-মায়ের শুরু হতো মজার তর্কযুদ্ধ। আমি আর রিফাত বাবার পক্ষে, মা একা। তবুও বাবা ইচ্ছা করেই হেরে যেতেন এবং মুচকি হেসে ছাতা ফেরত দিয়ে বলতেন রবিন, রিফাত এই ছাতা আমি তোদের উইল করলাম। মায়ের রাগ আরো বাড়ার আগেই ছাতা ফেলে দৌড়।

একদিন হঠাৎ করেই ঘটনাটা ঘটলো। বাবা মারা গেলেন। মা যে খুব কষ্ট পেলেন তা এক সপ্তাহ ছাতাটা ধরা অবস্থায় দেখেই বোঝা গেল। তার সমস্ত ভালোবাসার মানুষটি যেন সেই ছাতার ভেতরেই কোথাও লুকিয়ে আছে। আমরা তখনো স্কুলে। মা হাল ধরলেন। এই ছাতার নিচেই বড়

হলাম যেন আমরা দুই ভাইবোন, যেন এ ছাতাতেই মায়ের সমস্ত সাহস ভরসা। মাকে আরো একা করে মেরিন একাডেমি থেকে পাস করেই জাহাজে জয়েন করলাম।

ক্লাস ও থার্ডমেট পরীক্ষা দেয়ার জন্য ইওরোপেই ছিলাম সেদিন। মায়ের পাঠানো একটা প্যাকেট পেলাম। বাবার সেই প্রিয় স্মৃতিটুকু মা আমাকেই পাঠিয়ে দিলেন। কান্নাটা আর ধরে রাখতে পারলাম না। জাহাজের বৃজে ছাতাটা ধরে রইলাম। মনে হলো বাবা মা শক্ত করে জড়িয়ে ধরে আছেন আমাকে। দেশ থেকে অনেক দূরে একটা ছাতাতেই সেদিন এবং আজো আমি যখন ইচ্ছা পেয়ে যাই বাবাকে, পেয়ে যাই মায়ের ভালোবাসার ছায়া। আর ভাবি আমার সামনে এই সমুদ্রের মতোই আমার মা এখনো বিশালভাবে ভালোবাসেন বাবাকে।

towhid25@yahoo.com

অভাবী

মাসুদ রানা

এই যে শোনেন, এই শোনেন।

ছাতা সরিয়ে পেছনে চেয়ে দেখি মধ্যবয়স্ক এক মহিলা দাড়িয়ে আছে একটা টং দোকানের শেডের নিচে।

১৯৯৬ সাল। জুলাই মাস। বেশ কয়েকদিন থেকেই অবিরাম বৃষ্টি হচ্ছিল। যেন বৃষ্টির শেষ নেই। মাস্টার্স পড়ার সময় একটা টিউশনি করতাম। প্রচণ্ড বৃষ্টির জন্য আমার রুমমেটের কাছ থেকে ছাতা ধার নিয়ে পড়াতে গেলাম। কারণ বৃষ্টির জন্য দুই দিন যাইনি। পড়িয়ে ফিরতেই বৃষ্টির বেগ বেড়ে গেল। রাত প্রায় দশটা। আশপাশে কোনো রিকশা নেই। তাই ভাবলাম হেটেই চলে যাই। হাটছি হঠাৎ মহিলার কণ্ঠস্বর।

মহিলার কাছে গিয়ে জিজ্ঞাসা করলাম, আমাকে ডাকছেন?

মহিলার হ্যাসূচক জবাব।

মহিলার মুখের দিকে তাকালাম। শীর্ণ দেহ, ফ্যাকাশে মুখ। তার হাতে সবুজ পলিব্যাগ। তার ভেতর ভাতের বাটি।

তিনি আমাকে বললেন, গার্মেন্টসে চাকরি করেন?

বললাম, কেন?

এমনি জিজ্ঞাসা করলাম।

আমি ছাত্রের বাসা থেকে টিউশনি করে এলাম।

ও, আপনি ছাত্র।

হ্যা। এখন বলুন কি জন্য ডেকেছেন?

আসল কথা হলো, বাবা, আমার কয়েকদিন ধরে জ্বর এবং পুরনো শ্বাসকষ্ট বেড়েছে।

আমি কি করতে পারি?

তিনি বললেন, আমার বাসা বস্তির মধ্যে যদি আমাকে ছাতা দিয়ে একটু পৌছে দিতেন।

আমি মনে মনে ভাবতে লাগলাম, তিনি তো আবার মহিলা ছিনতাইকারী নয়। কেননা আমার পকেটে প্রায় তিনশ টাকা। এছাড়াও একটা দামি রিস্টওয়াচ ছিল। তবুও তার অবস্থা দেখে আমার রিস্টওয়াচ ও টাকার কথা ভুলে গেলাম। ওনাকে বললাম, আপনি রিকশায় করে চলে যান।

বাবা, আমি রিকশায় যেতে পারলে কি এখনো এখানে দাড়িয়ে থাকি।

কেন, টাকা নেই?

শোনেন বাবা, এক বাসায় কাজ করতাম। সেই বাসার আপার একটা সোনার চেন হারিয়ে গেছে। এর জন্য আমাকে মেরে বাসা থেকে বের করে দিয়েছে। তাছাড়া টাকা পেতাম তাও দেয়নি। তাই কোনো জায়গায় কাজ না পেয়ে এই গার্মেন্টসের বসের হাতে পায়ে ধরে সুতা কাটার কাজ নিয়েছি। এতো কষ্টের মধ্যেও হেসে বললেন, ঠিক মতো খেতেই পাই না আর তো রিকশা!

তাকে বললাম, রিকশা ডেকে ভাড়া দিয়ে দিচ্ছি, চলে যান।

প্রায় ত্রিশ মিনিট অপেক্ষা করলাম। যাও দুই একটা রিকশা পাওয়া যায় তাও এদিকে যেতে চায় না। যেতে চাইলে পাচ টাকার ভাড়া পনেরো বিশ টাকা চায়। এদিকে বাসার গেট সাড়ে এগারোটায় বন্ধ হয়ে যায়। অনন্যোপায় হয়েই বললাম, আমার ছাতার নিচে আসুন, বাসায় দিয়ে আসি।

তার অবস্থা দেখে আমার শরীরের অনেকাংশ ভিজিয়ে তাকে শুকনো রাখলাম। কারণ তার হাপানি এবং জ্বর দুটোই বেড়েছে। রাস্তা দিয়ে হাটতে হাটতে তাকে জিজ্ঞাসা করলাম, স্বামী নেই আপনার?

আমার স্বামী অনেক আগেই আমাকে ছেড়ে চলে গেছে। শুনেছি সে নাকি আবার বিয়ে করেছে।

ছেলেমেয়ে আছে?

ছেলে একটা ছিল সাত বছর বয়সে পানিতে ডুবে মারা গেছে। এখন একলা। খেয়ে না খেয়ে দিন কেটে যায়।

মহিলার শুকনো মুখ দেখে বড় মায়া লাগলো। বললাম, এখন কি খাবেন? কিছু খেতে ইচ্ছা করে?

না বাবা, তুমি অনেক করেছো।

বললাম, কি খেতে ইচ্ছে করে বলুন না?

বাসায় গিয়ে সকালের কয়টা পান্তা ভাত আছে তা খেয়ে শুয়ে থাকবো।

তারপরেও তার হাতে একটা পাউরুটি ও দুধ কিনে দিলাম। বললাম, রাতে খাবেন। শরীরের যা অবস্থা আপনার তাতে হাপানি বেড়ে যাবে, পান্তাভাত খেলে।

সে বললো, একদিন রুটি খেলে শরীরের কিছু হয় না। প্রতিদিন তো পান্তাভাতই খেতে হয়।

ইতিমধ্যে তার বস্তির কাছে এসে বললাম, এই ঘরে কয়জন থাকেন?

চারজন। সবাই গার্মেন্টসে কাজ করে।

দরজার কাছে গিয়ে বললাম, ঘরে চলে যান।

সে জোর করে ঘরে নিয়ে গেল।

ঘরের ভেতরে দেখি বৃষ্টির ছাট এসে ভিজে যাচ্ছে। প্লাস্টিকের কাগজ লাগানো বেশ কয়েক জায়গায়।

আমি রিস্টওয়াচ দেখে বললাম, আসি।

মহিলা বিস্ময়ে আমার মুখপানে চেয়ে রইলেন।

তাকে একশ টাকার একটা নোট ধরিয়ে দিয়ে বললাম, এই টাকা দিয়ে একটা ছাতা কিনে নেবেন।

নিতে চাইলো না। তবুও জোর করে হাতে গুজে দিলাম।

আমি আসছি, দেখি তাকিয়েই আছে। খুব করুণ লাগছিল। মনটা একেবারে বিষণ্নতায় ভরে গেল। বৃষ্টির মধ্যে ছাতা মাথায় হাটছি আর ভাবছি এই বর্ষাকাল আমার খুব প্রিয় ছিল। রুমের বারান্দায় বসে বৃষ্টি দেখতে খুব মজা পেতাম। এ মহিলার করুণ পরিণতি দেখে বর্ষাকাল অল্পতেই অপ্রিয় হয়ে উঠলো। বড়লোকেরা বৃষ্টিতে ভেজে শখে আর গরিব সাধারণ মানুষ বৃষ্টি থেকে বাচার জন্য একটা ছাতা কিনতে পারে না পয়সার অভাবে।

ঢাকা থেকে

আবিষ্কারের কাহিনী

আলতাফ হোসেন লাভলু

আবিষ্কার : ছাতা।

আবিষ্কারক : ছয়জন।

দেশের নাম : গ্রেট বৃটেন।

সাল আনুমানিক : ৭০০।

আবিষ্কারের কাহিনী : প্রাচীন ইজিপ্টে অভিজাতদের মধ্যে এক ধরনের ছাতার ব্যবহার ছিল। এটা অনেকটা রাজছত্রের কাজ করতো। তবে স্টিলের রিব দিয়ে কাপড়ে আবৃত আধুনিক ছাতার আগমন ১৭ শতকে। সাধারণের ব্যবহারযোগ্য এই ছাতার আবিষ্কারকের নাম জানা যায়নি। তবে এই মহতী আবিষ্কারের জন্য তারা যে ১০ মিলিয়ন ডলার লভ্যাংশ পেয়েছিলেন সে কথা জানিয়েছেন উইলিয়াম এস ওয়ালশ।

এদিকে আরেক গবেষক জোসেফ এমন কেন জানাচ্ছেন যে, প্রথম ছাতার ব্যবহার হয়েছিল বৃটেনের উইন্ডসরে এবং সেটা ১৭৪০ সালে। এবং সে ছাতা নিয়ে লোকজন ব্যাপক হাসাহাসি আর তামাশাই করেছিল তখন। কেউ একজন ছাতা নিয়ে বের হলে সঙ্গে সঙ্গে তার প্রতিবেশীরা ঝাড়ু চালুনি হাতে তার পিছু নিতো।

ঝাড়ুর হাতলে চালুনি ঠিকমতো বসিয়ে ধাওয়া করতে করতে ছাতাওয়ালার পিছে হাটতো। ধীরে ধীরে টিকটিকির লেজ খসে গেছে। এবং পরবর্তী কালে এ ছাতাই অতি গুরুত্বপূর্ণ প্যারাশুট আবিষ্কারের প্রেরণা যুগিয়েছে।

সিরাজগঞ্জ থেকে

হাদারাম

এনএম সালাম

বান্ধবী শর্বরীকে নিয়ে মল চত্বর থেকে রোকেয়া হলে তাকে এগিয়ে পৌছে যাচ্ছিলাম। ভিসির বাসা যখন আমরা অতিক্রম করছিলাম তখনই মুষলধারে বৃষ্টি শুরু হলো। অবশ্য সকাল থেকেই আকাশ মেঘলা ছিল।

ভাগ্যক্রমে শর্বরীর কাছে ছাতা ছিল। আমরা দুইজনে কোনো রকমে নিজেদের শরীর রক্ষা করতে ব্যস্ত ছিলাম।

আমি একটু লাজুক টাইপের। তাই তার শরীর ঘেষে বসতে ইতস্তত করছিলাম। এ জন্য বৃষ্টিতে ভিজে যাচ্ছিলাম।

শর্বরী তখন ধমক দিয়ে বললো, কাছে আসতে এতো ভয়?

আমি বললাম, যদি ফিরিয়ে দাও।

শর্বরী বললো, ছেলেদের সাহসী হতে হয় বুঝলে?

আমি তখন আকাশের চাদ হাতে পেলাম। সাহস করে বললাম, তুমি কি আমাকে...।

সে মুচকি হেসে বললো, এতোদিনেও বুঝলে না হাদারাম।

আমি তখন আনন্দে আত্মহারা হয়ে ছাতাটাকে আটকে রেখে বললাম, ধন্যবাদ হে ছাতা।

ঢাকা ইউনিভার্সিটি থেকে

হারানো প্রেম

মনির

আমি তখন ক্লাস এইটের ছাত্র। নানাবাড়ি মাগুরাতে বেড়াতে গিয়েছি।

একদিন আমাকে নানা বললেন, চলো ভাই, আমরা বাজার থেকে আসি।

নানার সঙ্গে রওনা দিই। নানা একটা ছাতা নিলেন এবং আমাকে একটা ছাতা দিলেন। নানা ছাতা মাথায় দিয়ে হাটছেন বাজারের উদ্দেশ্যে আর আমি ছাতা মাথায় না দিয়ে হাতে করে নানার পেছনে হাটছি। ছাতা যে মাথায় দেবো সে কথা আমার খেয়ালই নেই।

এক সময় নানা পেছনে তাকিয়ে দেখেন আমি ছাতা হাতে নিয়ে হাটছি। আমাকে ধমক দিয়ে নানা বললেন, ছাতা মাথায় দাও। না হলে গরমে মাথা ফেটে যাবে।

বললাম, নানা, ছাতা মাথায় দেয়ার কথা আমার মনে ছিল না।

এ কথা শুনে নানা খানিক হাসলেন।

পরে বাড়ি এসে নানি, খালা, মামাদের সামনে বললে সবাই আমাকে নিয়ে হাসাহাসি করতে থাকেন। আমি বেশ লজ্জা পাই তখন। এতো গেল এক ঘটনা। আরেকটা ঘটনা আছে। সেটাও বলছি।

জুন মাস। ১৯৯১ সাল। আমার ষান্মাসিক পরীক্ষা চলছে। আমি তখন নিউ টেনের ছাত্র। এদিন আমার উচ্চতর গণিত পরীক্ষা ছিল। পরীক্ষা দিয়ে একটার সময় বেরিয়ে স্কুলের সামনে কয়েকটা টেইলার্স ও স্টেশনারি দোকান আছে সেখানে আড্ডা দিই। হঠাৎ বৃষ্টি এলে হিরো টেইলার্সের ওমরভাইয়ের কাছ থেকে একটা ছাতা নিয়ে বাড়ির উদ্দেশ্যে বেরিয়ে পড়ি।

ধীরে ধীরে হাটছি। ছাতা মাথায় দিয়ে বর্ষার রিমঝিম বৃষ্টিকে এনজয় করছি এমন সময় পেছনে কয়েকটা মেয়েলি কণ্ঠ শুনে পেছনে ফিরে তাকিয়ে দেখি, কয়েকটা মেয়ে আসছে। তাদের সঙ্গে পলি। পলি হচ্ছে আমার প্রাইমারি স্কুল জীবনের সহপাঠিনী। আমরা একজন আরেকজনকে নাম ধরে ডাকতাম। আমরা বেশ ঘনিষ্ঠ ছিলাম। পলি অত্যন্ত সুন্দরী মেয়ে। পলির প্রেম পাওয়ার জন্য অনেক

ছেলেই দিওয়ানা। পলি হিন্দু। এরপরও ডজন ডজন মুসলমান ছেলে পলির জন্য এক পায়ে খাড়া জীবন দিতে।

ক্লাস ফাইভের পর এই টেন পর্যন্ত পাচ বছর কখনো পলির সামনে দাড়াইনি এবং কথা বলাও হয়ে ওঠেনি। ভেবেছি, পলি হয়তো ভুল বুঝতে পারে। কারণ পলির চারপাশে শুধু পলিকে চাওয়া–পাওয়ার পাগলের দল। এছাড়াও আরেকটি কারণ হচ্ছে, প্রাইমারির গণ্ডি পার হওয়ার পর পলি গার্লস এবং আমি বয়েজ হাই স্কুলে ভর্তি হই। সম্ভবত এ জন্যই এতো দূরত্ব তৈরি হয়েছে আমাদের মধ্যে। অথচ প্রাইমারিতে থাকাকালে আমরা অনেকটা কাছাকাছি ছিলাম।

পরে পলির দিকে লক্ষ্য করে দেখি পলি ভিজতে ভিজতে বাসায় ফিরছে। পলির বাবা অত্যন্ত বড় লোক ব্যবসায়ী। তার মেয়ে এভাবে ভিজে ভিজে পথ চলছে! কেমন যেন একটা অসহায় লাগছে। আমার সমস্ত সঙ্কোচ ঝেড়ে ফেলে বললাম, কি ব্যাপার পলি, ভিজতে ভিজতে যাচ্ছো কেন? এই নাও ছাতা।

পলি তো নেবে না।

বললো, না, কোনো অসুবিধা হবে না। এভাবেই যেতে পারবো।

আমি বলি, তাই হয় নাকি? এই নাও ছাতা বলেই পলির মাথার ওপর ছাতা ধরে পরিস্থিতি স্বাভাবিক করার জন্য জিজ্ঞাসা করলাম, আজ তোমার কি পরীক্ষা ছিল?

পলির উত্তর, হিসাবরক্ষণ।

আমাদের মধ্যে তখন পড়াশোনা বিষয়ক কথা চলতে থাকে। এক সময় পলিদের বাড়ির সামনে চলে আসি। আমাকে ধন্যবাদ জানিয়ে পলি চলে গেল বাড়ির মধ্যে। সেদিন এ পর্যন্তই।

এরপর স্কুলে যাওয়া আসার সময় দেখা হলে আমরা একে অপরের কুশলাদি জিজ্ঞাসা করি। একদিন দুই দিন করে আবার আমাদের টেস্ট পরীক্ষা শুরু হয়েছে। টেস্ট পরীক্ষার পর একদিন বিকেলে কোচিং ক্লাস করে বাড়ি ফিরছি পলিদের বাসার সামনে দিয়ে। আমি দেখতে পাই পলি একজন মহিলার সঙ্গে জানালার পাশে দাড়িয়ে আছে। আমাকে দেখে পলি ডাক দেয় বাসার ভেতরে যাওয়ার জন্য। আমি যেতে চাই না। পলি বাসা থেকে বেরিয়ে আসে এবং আমাকে বাসার মধ্যে নিয়ে তার মায়ের সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দেয়। পলির মাকে প্রণাম করে পলির সঙ্গে রিডিং রুমে গিয়ে বসি।

পলি আমাকে জিজ্ঞাসা করে, পরীক্ষার প্রস্তুতি কেমন নিয়েছো?

আমি বলি, মোটামুটি।

ভালো ছাত্র হিসেবে ফ্রেন্ড সার্কল এবং এলাকাতে মোটামুটি সুনাম ছিল আমার। হয়তো এ জন্যই পলি আমার কাছে বিভিন্ন সাবজেক্টের নোট চায়। যেহেতু পলি মানবিক আর আমি বিজ্ঞান বিভাগের সেহেতু পলিকে বলি যে, কমন সাবজেক্টগুলোর নোট দিতে পারবো।

এভাবে নোট দেয়া–নেয়া করতে করতে নিজেকে অন্য রকম ভাবে আবিষ্কার করি। বুঝতে পারি, পলির ওপর বেশ দুর্বল হয়ে পড়েছি। এবং সেটা মানসিক, শারীরিক উভয় দিক দিয়েই। পলির যেসব অতিরিক্ত সাবজেক্ট ছিল সেসব সাবজেক্টেরও নোট জোগাড় করে দিয়েছি। বিভিন্ন স্কুলের, বিভিন্ন স্যারের সাজেশন ম্যানেজ করে দিয়েছি। আমাদের এসএসসি ফাইনাল পরীক্ষা একেবারেই কাছে। এ মুহূর্তে পড়াশোনায় মন না দিয়ে কোনো মেয়ের প্রতি আকৃষ্ট হলে পড়াশোনার যে চরম ক্ষতি হবে তা জানি। কিন্তু পলির প্রতি বাধভাঙা আকর্ষণে সব কিছু তুচ্ছ মনে হয়।

একদিন পলিদের বাসায় গেছি আমার জেনারেল ম্যাথসের নোট খাতা আনতে। সেদিন ছিল ছুটির দিন। পলিদের বাসাতে এমনিতেই লোকজন কম। তাছাড়াও কেউ কারো দিকে ভ্রুক্ষেপ করে না। পলিকে তার বেডরুমে একা পেয়ে আমার ভেতরের সত্তাটি বেশ বেপরোয়া হয়ে ওঠে। পলির সঙ্গে প্রসঙ্গ পাল্টিয়ে সেক্সুয়াল ধরনের গল্প করতে থাকি। জিজ্ঞাসা করি, ব্লু–ফিল্ম বা চটি বই পড়েছে কি না? লক্ষ্য করি, পলি আমার কথায় বেশ লজ্জা পাচ্ছে। উঠে গিয়ে পলির একটা হাত ধুরে চুমু দিই। পলির জগৎ যেন কেপে ওঠে সঙ্গে সঙ্গে। পলি আমাকে জড়িয়ে ধরে। পলিকে ইচ্ছামতো চুমু দিতে থাকি। কপালে, চোখে, গলায়, ঠোটে। পলির বুকের ওপর মুখ ঘষতে থাকি। উত্তেজনায় পলি আমার মাথা চেপে ধরে তার নরম বুকের ওপর। দেরি না করে পলিকে পাজাকোলা করে বেডে তুলে নিই। পলিকে অনাবৃত করে নিজেও অনাবৃত হই। পলির যৌবন সাগরে ঢেউ তুলতে থাকি।

সবশেষে পলিকে আরেক দফা চুমু খেয়ে বাড়ি চলে আসি। সপ্তাহ খানেক পরে হঠাৎ লোক মাধ্যমে শুনলাম, পলি ইনডিয়াতে চলে গেছে। শুনে খুব খারাপ লাগলো। ব্যাপার কি অনুসন্ধান করতে লাগলাম। অনুসন্ধান করতে গিয়ে যে তথ্য পেলাম তা হচ্ছে স্থানীয় সন্ত্রাসীরা পলিকে কিডন্যাপ করে এবং পলির বাবার কাছে তিন লাখ টাকার পণ দাবি করে। পলির বাবা সন্ত্রাসীদের তিন লাখ টাকা দিয়ে পলিকে ছাড়িয়ে নিয়ে আসেন এবং রাতারাতি পলিকে ইনডিয়া পাঠিয়ে দেন। সেই থেকে পলি বাংলাদেশে আর আসেনি। দেখাও হয়নি আমার সঙ্গে। কি জানি পলি এখন কেমন আছে? মনে পড়ে কি না সেই ছুটির দিনের কথা যার শুরু হয়েছিল বৃষ্টি ভেজা দিনে ছাতার মাধ্যমে।

মালয়শিয়া থেকে

মাছ ধরা

আরিফুল ইসলাম

সময়টা বর্ষাকাল। চারদিকে থৈ থৈ পানি। গ্রামে বেড়াতে গেছি। গিয়ে শুনলাম প্রচুর মাছ পড়ছে। মামাতো ভাই সঞ্জয় বললো, কোচ থাকলে মাছ ধরা যেতো।

নানিকে বললাম, নানি কোচ আছে? মাছ ধরবো।

নানি বললেন, কোচ নেই। তবে তোমার নানার পুরনো ইদুরে কাটা একটা ছাতা আছে। ছাতার শিক ঘসে কোচ বানাও।

নানির পরামর্শ মতো ছাতার শিক ঘষে বাশের মাথায় লাগিয়ে কোচ বানালাম। মাছ ধরতে গিয়ে দেখলাম লোকজনের ঘের থেকে বের হওয়া মাছ চারদিক গিজ গিজ করছে। কোচ দিয়ে সে সময় প্রচুর মাছ ধরলাম। মাছ খেতে খেতে মনে হলো, পুরনো ছাতার শিক, সেও তো উপকারী।

কসাইটুলী, ঢাকা থেকে

কাজের জিনিস

সিরাজ–উদ–দ্দৌলা

আবদুল চাচার বহু দিনের আবদার, আমার সঙ্গে একবার ঢাকা যাবেন। কতোবার যে বায়না ধরেছেন তার হদিস নেই। আমিও নানান ব্যস্ততার জন্য সময় করে আনতে পারিনি। একদিন তার বিরক্ত সহ্য করতে না পেরে বললাম, চাচা, কাল সকালে ঢাকার উদ্দেশে রওনা হবো। চাচার খুশি দেখে কে? এতোদিন সঙ্গে না নেয়ার অন্যতম কারণ ছিল, চাচা গ্রামের সহজ সরল মানুষ।

পরদিন খুব ভোরে চাচা তৈরি। খুব সকালে আমাকে ডাকাডাকি শুরু করলো। সারা বাড়িতে হই চই ফেলে দিল, অনিচ্ছা সত্ত্বেও উঠে তৈরি হলাম।

কিন্তু চাচার সঙ্গে একি? চাচা তার পুরনো ছাতাটি বগলে চেপে বললো, চল।

বললাম, চাচা, ছাতা কেন?

চাচা বললেন, ছাতা বিপদের বন্ধু। একে তো আষাঢ় মাস তার উপরে বিজলি চমকাচ্ছে দেখিস না। অবশেষে তার যুক্তি মানতে হলো। কি আর করা। কিছুদূর যাওয়ার পর মুষলধারে বৃষ্টি শুরু হলো। সে কি আর ছাতায় মানে। তার উপর এক ছাতায় দুজন মানুষ। কোনো রকমে দৌড়ে কাকভেজা হয়ে একটা *এল* টাইপের লম্বা কাছারির বারান্দায় উঠলাম।

প্রশ্ন করি, চাচা, এইটা কার বাড়ি।

চাচা বললেন, *চিনস না? এই যে ছাতা মার্কা চেয়ারম্যান হইছিল, সন্ত্রাসী লালু চেয়ারম্যানের বাড়ি। মানুষে কয় তার মার্কা ছাতা না হইয়া বন্দুক হওনের দরকার ছিল।*

তখন হঠাৎ কিশোর বেলার কথা মনে হতেই আমার হাসি পেল।

লালুকে ছোটবেলা থেকে চিনি। পড়ার সময়ে লালু বখাটে ধরনের ছিল। এক বর্ষাকালে স্কুলের লায়লা ম্যাডামের ছাতা চুরি করেছে প্রমাণ হওয়াতে কান ধরে পুরো স্কুল চক্কর দেয়। আজ সেই লালু *ছাতা মার্কায়* চেয়ারম্যান হয়েছে। মনে মনে হাসি। তারপর বৃষ্টি একটু কমলে কোনো রকমে স্টেশন পৌছি। আবার শুরু বৃষ্টি।

চাচাকে স্টেশনের সিগনালম্যান বলে, *আপনার ছাতাটি একটু দেবেন? সিগনাল দিতে অইবো। রেল আইবো।*

চাচা তাকে ছাতা ধার দিলেন। চাচা বললেন *তোরে কইছিলাম না ছাতা খুবই কাজের জিনিস।*

ইতিমধ্যে রেল এলে আমরা খুবই তাড়াহুড়া করে আগে সিট দখল করার জন্য উঠি। রেল ছাড়ার পনেরো–বিশ মিনিট পর চাচা বললেন সিগনালম্যান ছাতা ফেরত দেয়নি।

বললাম, ঠিক আছে, ঢাকায় গিয়ে নতুন ছাতা কিনে দেবো।

চাচা কিছুতেই মানছেন না। পাশের সিটের ভদ্রলোক তাকে অনেক সান্ত্বনা দিলেন।

নির্ধারিত সময়ের দুই ঘণ্টা পরে কমলাপুর স্টেশনে পৌছি। কেটলি দোকান থেকে দুই কাপ চা খেয়ে রিকশায় উঠি। ঢাকায় খুবই বৃষ্টি ও সঙ্গে দমকা হাওয়া। বাতাসের তীব্রতায় রিকশার পর্দা বার বার উঠে যাচ্ছে।

চাচা বললেন, বলছিলাম না, ছাতা খুবই কাজের জিনিস।

গুলিস্তান থেকে একটা নতুন ছাতা কিনলাম। তিন বছরের গ্যারান্টি ও রঙ পাকা, নকল হতে সাবধান, এক নাম্বার হালদা ছাতা।

ছাতা মাথায় দুজনে পায়ে হেটে গন্তব্যের দিকে যাই। কিছুদূর যাওয়ার পর আমার শাদা শার্টে কালো দাগের ছাপ চাচা আবিষ্কার করলেন। চাচা মাথায় হাত দিলেন। সামনের মোড়ে টাঙানো শাদা ছাতা দেখে চাচা বললেন, কালো ছাতা না কিনে শাদা ছাতা কিনলে তো এ অবস্থা হতো না।

চাচাকে বলি, এটা ট্রাফিক পুলিশের জন্য নির্ধারিত।

চাচা বললেন, ঘুস খেলে ছাতার রঙ ও গায়ের রঙ শাদা হয় নাকি?

এ প্রশ্নের জবাব আমার জানা ছিল না।

সংযুক্ত আরব আমিরাত থেকে

ধন্যবাদ

হ্যাপী

সালটা ছিল ১৯৯৮। তখন আমি ক্লাস সেভেনে পড়ি। বয়স কতোই বা হবে, এগারো কি বারো। কেবল প্রেমরূপ অনলে পা দিয়েছি। প্রেমের বর্ণমালা মুখস্ত করা শুরু করেছি। আমার প্রেমিকটা ছিল সুদর্শন। কিন্তু তার একটা বদঅভ্যাস ছিল। সে সব সময় নিজেকে সাহসী বলে সে উপস্থাপন করতো। একদিন আমরা ঠিক করলাম এই বর্ষার একটা দিন নদীর তীরে এক সঙ্গে কাটাবো। নির্ধারিত দিনে আমরা রিকশায় চড়ে গন্তব্যে রওনা দিই। তখন অবশ্য টিপটিপ করে বৃষ্টি পড়ছিল। কিন্তু তার হাতে ছাতা থাকা সত্ত্বেও সে মেলছিল না। আমার খুব রাগ হচ্ছিল। প্রথম প্রেম তো, এ জন্য সাহস হয়নি তার সঙ্গে রাগ করতে।

যাওয়ার পথেই ছিল সেই সুদর্শনের এক আত্মীয়ের অফিস। অফিসের কাছাকাছি আসতেই আমাকে আমতা আমতা করে সে বললো, এই, তোমার গায়ে বৃষ্টির ফোটা পড়ছে। জ্বর আসবে তো। ছাতাটা খুলি কেমন?

তার এ কথা শুনে আমার খুব হাসি পাচ্ছিল। তাই কিছু না বলে মাথাটা ঘোরালাম। আসলে কি সে ভয়ে ছাতাটা খোলে যদি তার আত্মীয় আমার সঙ্গে তাকে দেখে তার মা-বাবাকে বলে দেয়। তাহলে নির্ঘাত নজরবন্দী তো হতেই হবে উপরন্তু চোখ দিয়ে নোনাজল এমনিই ফেলতে হবে। এর আগে আমাকে সান্ত্বনা দিয়ে সে বলতো কিসের ভয়, লোকে দেখলে দেখবে। প্রেমে কোনো ভয় নেই।

কিন্তু আজ একি দেখলাম। সে তো ভয়ে আমাকে ছাতা কি দেবে ছাতা দিয়ে তার মুখ ঢেকেছে। পরে গন্তব্যে পৌছার পর আবার আরেক সমস্যা দেখা দিল। ট্রেন আসছিল ঢাকা থেকে। এবার যে আমার ভয় করছে। আমার আন্টি আসার কথা ঢাকা থেকে এবং আজই এ ট্রেনে। রেল লাইনের পাশ দিয়েই আমরা হাটছিলাম। তাই আড়াল হওয়ার কোনো জায়গা না পেয়ে অবশেষে ছাতার কথা মনে পড়লো। তাই তাড়াতাড়ি করে এবার তাকে একই কথা বলে ছাতাটা মাথায় দিয়ে উল্টো মুখ হয়ে দাড়িয়ে থাকলাম। এবং ট্রেন আমার পাশ দিয়ে ধিক ধিক সুর তুলে চলে গেল। নদীর তীরে প্রায় চার ঘণ্টা কাটানোর পর বাসায় ফিরে দেখি, সত্যিই আমার আন্টি এসেছে এবং সেই ট্রেনেই।

আমাকে পরে একদিন তিনি বলেছেন, একটা মেয়েকে তিনি দেখেছেন, খুব সুন্দর ফুল আর্ট করা এবং লাভ চিহ্ন দেয়া একটি ছাতা হাতে দাড়িয়ে থাকতে। ছাতাটি নাকি তার খুব পছন্দ হয়েছে।

ইশ! সেদিন কিভাবে যে বেচে গেছি। ছাতাটা না থাকলে কি যে হতো। হয়তো সেই থেকেই আমি হতাম গৃহবন্দী আর আমাদের প্রেমের অকালমৃত্যু হয়তো সেদিনেই ঘটতো। অবশ্য আমাদের প্রেমের করুণ মৃত্যু এখনো হয়নি। আশা করছি আমাদের এ প্রেম বেচে থাকবে চিরদিন। সেই সঙ্গে ধন্যবাদ জানাই সেই রঙিন ছাতাকে যে আমাদের প্রেমকে আরো দৃঢ় করেছে।

ঠিকানা প্রকাশে অনিচ্ছুক

ভূত

ইসমাইল হোসেন খান শামীম

কিশোর বয়সে আম কুড়ানোর অভিজ্ঞতা কম বেশি সবারই আছে। তা থেকে আমিও ব্যতিক্রম নই। লক্ষ্মীপুর, রায়পুর, রামগঞ্জ, রামগতি ও ফরিদগঞ্জ এলাকায় সুপারির বাগান দেশের অন্যান্য থানা থেকে একটু বেশি। ভূতের ভয়ও এই এলাকার লোকজনের মধ্যে থাকে। এছাড়াও এ এলাকায় বেশির ভাগ আম গাছই পুকুর পাড়ে।

জ্যৈষ্ঠ মাসে শিলা বৃষ্টিতে প্রচুর ঝড়ের মধ্যে মা একটা ছাতা ধরিয়ে দিলেন আম কুড়ানোর জন্য। প্রচুর আম কুড়িয়ে পুকুর পাড় থেকে উপরে উঠে আসার সময় যতোই উপরে ওঠার চেষ্টা করছি ততোই ছাতাটি আমাকে পুকুরের ভেতরে টেনে নিয়ে যাচ্ছে। শত চেষ্টা করেও উপরে উঠতে পারলাম না। শেষ পর্যন্ত ভাবলাম, ভূত তো আমাকে ভালোভাবেই চেপে ধরেছে। মনে হয় বাচার সম্ভাবনা নেই। পুকুরে ডুবে হাবুডুবু খাচ্ছি আর দেখলাম ছাতাটি ভেঙে ওলোট-পালোট হয়ে গেছে।

বৃষ্টি কমে গেল। ঝড় থেমে গেল। পুকুরে আমগুলো কি হয়েছে জানি না। তবে এটা বুঝতে পেরেছি, ভূত আমাকে মেরে ফেলেনি। বাসায় ফিরে মাকে জড়িয়ে ধরে হাউমাউ করে কান্নায় ভেঙে পড়লাম। কান্নার কারণ ভূত নয়, কেদেছি মহামূল্যবান ছাতাটির জন্য।

১৯৭৮ সালের ঘটনা। তখন ছাতা ছিল খুবই দুর্লভ। ইচ্ছা করলে যে কেউ ছাতা ব্যবহার করতে পারতো না।

রায়পুর, গাজীপুর থেকে

চোরি চোরি চুপকে চুপকে

তানিয়া সুলতানা রিমা

খুব ভোরে ভাইয়ার ডাকাডাকিতে ঘুম ভাঙতেই দেখলাম ভাইয়ার হাতে একটা টকটকে লাল গোলাপ। ঠিক তখনই মনে পড়ে গেল আজ ২৪ জুলাই। মানে আমার জন্মদিন।

বিকেলে লাবনী ও শিমুল এলো শাড়ি পরে। আমিও বড় আপুর নীল কাতান শাড়িটা পরে ফেললাম ঝটপট।

বড় আপুর বাসাটা যেহেতু উত্তরায় সেহেতু কাছাকাছি কোথাও ঘুরে বেড়ানোর জায়গা হিসেবে ওয়াটারফ্রন্টকেই বেছে নিলাম।

লেকের পাড়ে বসে বেশ কিছুক্ষণ আড্ডা এবং হালকা কিছু খাবার–দাবারের পর্ব সেরে সেখান থেকে বের হয়ে আসতেই গুড়ি গুড়ি বৃষ্টি শুরু হয়ে গেল। আকাশের দিকে তাকিয়ে দেখলাম, প্রচণ্ড কালো মেঘে আকাশটা ছেয়ে আছে। হাটার গতি বাড়িয়ে দিলাম তিনজনই।

হঠাৎ দেখলাম, সামনের নীল রঙের টি–শার্ট এবং হালকা আকাশি রঙের জিনস পরা একটি ছেলে ছাতার মাথায় দিয়ে যাচ্ছে। লাবনীটা আবার বাজি ধরায় ওস্তাদ। পেছন থেকে ছেলেটাকে দেখেই বলে বসলো, তোদের কেউ একজন যদি সামনের ছাতাওয়ালার কাছ থেকে ছাতাটা নিয়ে আসতে পারিস তাহলে এক্ষুণি তোদেরকে *সিলভার প্যালেসে* নিয়ে চায়নিজ খাওয়াবো।

এ রকম লোভনীয় প্রস্তাবকে কি হেলাফেলা করা যায়। তাই দ্রুত পা বাড়ালাম ছাতাওয়ালার দিকে। একেবারে কাছাকাছি গিয়ে বেশ বিনয়ী কণ্ঠে বললাম, এক্সকিউজ মি, আপনার ছাতাটা কি মাত্র পাচ মিনিটের জন্য আমাকে দেয়া যাবে?

আমার দিকে সে পাশ ফিরে তাকাতেই বিস্ময়ে হতবাক হয়ে গেলাম তার সৌন্দর্য দেখে। ছেলেদের জন্য যদি বিশ্ব সুন্দর প্রতিযোগিতার আয়োজন করা হতো আর এই তরুণ যদি সেই প্রতিযোগিতায় অংশ গ্রহণ করতো তাহলে নির্ঘাত প্রথম স্থান অধিকার করে বসতো। আমাকে আরো অবাক করে দিয়ে সেই অনিন্দ সুন্দর তরুণ আমার দিকে মুগ্ধ দৃষ্টিতে তাকিয়ে থাকলো কয়েক সেকেন্ড। তারপর সত্যি সত্যি তার ছাতাটা বাড়িয়ে ধরলো আমার দিকে। ততোক্ষণে রিমঝিম বৃষ্টিটা ঝুমঝুম বৃষ্টিতে পরিণত হয়েছে।

আমি তখন বাজিতে জেতার আনন্দে ছাতাটা হাতে নিয়ে দ্রুত কেটে পড়লাম সেখান থেকে। গন্তব্য সিলভার প্যালেস। শিমুল ও লাবনীর কাছ থেকে বিদায় নিয়ে বাসায় পৌছালাম সন্ধ্যা সাতটায়।

বাসায় ঢুকতেই হাতের ছাতাটার কথা মনে পড়ে গেল। ভীষণ অপরাধী মনে হলো নিজেকে। বান্ধবীদের সঙ্গে মজা করতে গিয়ে কি জঘন্য একটা অন্যায় করে ফেলেছি।

সেদিন থেকে আমার দুই চোখ সেই অচেনা ছেলেটিকে খুজে বেড়াচ্ছে সবখানে। সে আমাকে বিশ্বাস করে তার ছাতাটা আমাকে দিয়েছিল ২০০১-এর ২৪ জুলাইতে। অথচ আজও তাকে খুজে পাওয়ার মতো সামান্যতম সূত্রও পেলাম না। তবু আমার মন বলে, নিশ্চয়ই একদিন তাকে খুজে পাবোই। আর তখন আমার কাছে অতি যত্নে সংরক্ষিত তার ছাতাটা তাকে ফিরিয়ে দিয়ে বলবো, বিশ্বাস করুন, আমি ছাতা চোর নই।

চরফ্যাশন, ভোলা থেকে

স্যার

পুলক হাসান

ধলেশ্বরী নদী তীরের চিক চিক বালির ধার ঘেষে সোজা উত্তর-পশ্চিমে চলে গেছে হাটে যাবার রাস্তা। রাস্তার পাশে চটকল। চটকলের পরে কিছু আকা-বাকা পথ প্রায় মাইল খানেক পার হলেই স্যারের বাড়ি। আমাদের গ্রামের প্রাইমারি স্কুলের সাবেক প্রধান শিক্ষকের বাড়ি। আদর্শ শিক্ষক হিসেবে তার সুনাম সর্বজনবিদিত। স্কুলে মাঝারি আকৃতির এ স্যার আমার বাল্য জীবনের সবচেয়ে শ্রদ্ধেয় স্যার। প্রতিদিন বাড়ি থেকে মাথায় কালো ছাতাকে অবলম্বন করে হেটে স্কুলে আসতেন। স্যারের ছাতার মধ্যভাগ ছিল কালো কাপড় দিয়ে জোড়া দেয়া আর সমগ্র ছাতা জুড়ে পিপড়ে কাটার মতো অসংখ্য ফুটো। প্রাইমারি স্কুল জীবনে এ স্যার আমাকে পড়াশোনার ক্ষেত্রে বিশেষভাবে হেলপ করতেন।

একদিন বাজার থেকে ফেরার পথে স্যারের সঙ্গে দেখা। অনেক প্রসঙ্গের মাঝখানে আব্বা জানতে চাইলেন, স্যারের চুল পেকে যাচ্ছে কেন।

জবাবে স্যার বলেছিলেন, আমার যে মাথায় ছাতা ধরার কেউ নেই। স্যারের এ কথার মর্ম সেদিন বুঝতে পারেনি। আব্বাকে বললাম, এবার যদি আমি পরীক্ষায় প্রথম হই তাহলে স্যারকে একটা নতুন ছাতা কিনে দিতে হবে। আব্বা সহাস্যে রাজি হয়েছিলেন।

আমি প্রতিবারই ক্লাসের বার্ষিক পরীক্ষায় প্রথম হতাম, সে বছরও হলাম। সে বছর আবার তফাজ্জল হোসেন মেমোরিয়াল ট্রাস্টের পক্ষ থেকে ক্লাস ফোরের ছাত্রছাত্রীদের মধ্যে বৃত্তি পরীক্ষা হয়েছিল। সেই পরীক্ষায় আমার জন্য স্যার বিশেষভাবে সময় দিয়েছিলেন এবং আমি *এ গ্রেডে* বৃত্তি পেয়েছিলাম। তাই বৃত্তি পরীক্ষার রেজাল্ট দেয়ার পর একটি নতুন *আলম ছাতা* এবং এক প্যাকেট মিষ্টি নিয়ে স্যারের বাড়ি হাজির হলাম।

স্যারের বাড়ির কাছাকাছি যেতেই চিৎকার, চেচামেচির আওয়াজ পাচ্ছিলাম। প্রথমটার কিছুই বুঝতে না পারলেও সেখানে স্যারকে এক অন্যভাবে আবিষ্কার করলাম। এক অসহায় পিতা, এক অসহায় স্বামী। স্যারের পরিবারের সদস্য সংখ্যা সাতজন, দুই ছেলে, দুই মেয়ে, বৃদ্ধ মাতা এবং তারা স্বামী–স্ত্রী। বড় মেয়ে লেখাপড়া করে না, ছোটটি স্কুলে পড়ে আর ছেলে দুজনেই উচ্ছন্নে গেছে। এক ছেলে কাঠমিস্ত্রির দোকানে কাজ শেখে, অন্যটি পাড়ায় রংবাজি করে বেড়ায়। আমি কাছে যেতেই দেখলাম স্যার গালে হাত দিয়ে বসে আছেন আর তার ছোট ছেলেটি উচু স্বরে চেচাচ্ছে। আমাকে দেখে স্যার কোনো মতে মিষ্টির প্যাকেটটি রেখে নতুন ছাতাটি নিয়েই আমাকে নিয়ে বড় রাস্তার ধারে চলে এলেন।

স্যার রাস্তায় এসে আব্বা আম্মার কথা জিজ্ঞাসা করছে আর আমাকে নানান ধরনের উপদেশ দিচ্ছেন। তখন ছিল আষাঢ় মাস। হঠাৎ ঝুপ করে বৃষ্টি এলো। আমাকে কোলে তুলে ছাতা মেলে ধরলেন স্যার। আমি স্যারের কোলে আর স্যার মৃদু পায়ে আমাকে নিয়ে পথ চলছেন। কিন্তু আমার চোখে ভাসছে স্যারের বাড়ির সেই ঘটনার প্রতিচ্ছবি। স্যারের ছেলেটি আমার সামনে স্যারকে ধমক দিয়েছিল, এমনকি স্যারের জামা কাপড় পর্যন্ত বাইরে ফেলে দিচ্ছিল স্যারকে বাড়িতে থাকতে দেবে না বলে। বিশ্বাস করতে পারছিলাম না ঘটনাটিকে। যে স্যার আমাদের গ্রামে এলে আবাল–বৃদ্ধ–বণিতা সকলেই সালাম দেয়, সম্মান করে তার এমন অবস্থা।

পথ চলতে চলতে হঠাৎ কাধের কাছে গরম জলের স্পর্শ পেলাম। চোখ তুলে তাকালাম স্যারের দিকে। স্যারের দুচোখ বেয়ে পানি পড়ছে, চোখ দুটো ঈষৎ রক্তাক্ত। সে অবস্থাটির বর্ণনা দিতে পারবো না। কি থমথমে আর কি অসহায় মুখ দেখেছিলাম। বোকার মতো স্যারের কাছে কান্নার কারণ জানতে চাইলাম।

স্যার আবারও বললেন যে, এর মাথায় ছাতা ধরার কেউ নেই তো, তাই।

সেদিন না বুঝলেও আজ বুঝতে পারি। কেন সেদিন স্যার এ কথা বলেছিলেন। সরকারি প্রাইমারি স্কুলের স্বল্প বেতনে পরিবারের ভরণ–পোষণ পূর্ণ করা স্যারের জন্য ছিল এক কঠিন ব্যাপার। অনেকবার চিন্তা করেছি, স্যার এখন কি করছেন এবং অনেকবারই মনে হয়েছে, স্যারের পাশে দাড়াবো। কিন্তু পরক্ষণেই ভুলে গেছি। স্যারের খবর আর নেয়া হয়নি। কিছুদিন আগে খবর পেয়েছি স্যার অবসর নিয়েছেন। স্যারের দীর্ঘ জীবন কামনা করি।

গোপিবাগ, ঢাকা থেকে

জাপানি

মীর্জা মোর্শেদুজ্জামান

আমার ভাগ্নে লিংকন জাপানে থাকে। জাপান থেকে আসার সময় সে আমার জন্য একটি জাপানি ছাতা এনেছিল। হলুদ রঙের ছাতাটি দেখতে খুব সুন্দর। মজার ব্যাপার হলো, ছাতাটিকে শিক থেকে খোলা যায় এবং সামান্য ছোয়াতেই সম্পূর্ণ খুলে যায়। ছাতাটি মাথায় দিয়ে কোথাও বের হলে লোকজন এর দাম এবং কোথা থেকে কিনেছি সে সম্পর্কে জানতে চায়। লোকজন যখন শুনতে পায়, এটি জাপানি ছাতা তখন আগ্রহ নিয়ে নেড়েচেড়ে দেখে।

ভাগ্নের দেয়া জাপানি ছাতাটি রোদ–বৃষ্টি সবসময়ে আমার সঙ্গে থাকে। ছাতাটি আমার প্রিয় জিনিসগুলোর একটি।

শ্রীমঙ্গল থেকে

শক্ত বাধন

মনির

এক কেজি মসুরি ডাল দেন তো? কেজি কতো?

৩৮ টাকা। তার উত্তর।

তুমি আমজাদের ছেলে মনির না?

হ্যা, আমার উত্তর।

বাবা, আমার একটি কাজ করে দিবা?

কি কাজ?

আমার মেয়ে স্কুলে গেছে, বৃষ্টি হচ্ছে, তুমি একটু তাকে এগিয়ে নিয়ে এস।

তাই করলাম। আকাশে হালকা মেঘ, গুড়ি গুড়ি বৃষ্টি পড়ছে। স্কুলের সামনেই তার দেখা।

পলিআপা কেমন আছেন?

ভালো, আপনি কেমন আছেন?

আজ ছাতা আনেননি?

না।

তাই আমাকে আসতে হলো।

বৃষ্টি আরেকটু জোরে আসতে লাগলো, আমরা বাড়ির দিকে হাটতে লাগলাম। পলি আমাদের পাশের বাড়ির চাচাতো বোন। এবার ক্লাস টেনে পড়ে। সুন্দর দেহ, লম্বা কেশ, কালো চোখ। দেখলেই প্রেমে পড়তে ইচ্ছে করে।

মনিরভাই, আপনার কাছে নাকি *নারী* বইটি আছে?

হ্যা।

পড়েছেন?

পড়েছি।

কোন বিষয়টি আপনার ভালো লেগেছে?

ধর্ষণ।

এর একটু বলেন তো?

এখন?

হ্যা।

১৯৮২ সালে বিলেতে এক বিচারক মন্তব্য করেন যে, নারীরা না বলে, তারা সব সময় না বোঝায়, না। বিষয়টা শুধু না বলা নয়। বিষয়টা হচ্ছে, সে কিভাবে না বলছে, কিভাবে সে নিজের বক্তব্য স্পষ্ট করছে। সে যদি এটা না চায় তাহলে তার উচিত, তার দুই পা চেপে বন্ধ করে রাখা। বল প্রয়োগ ছাড়া তার ভেতরে ঢোকা সম্ভব নয়। এক্ষেত্রে নারীর উত্তর মনে থাকে না।

আপনি তো খুব ভালো বলতে পারেন। বক্তৃতা করেন নাকি?

তা হবে কেন? আমার উত্তর।

বৃষ্টি অনেক জোরে এলে আমরা একটি গাছের নিচে দাড়িয়ে রইলাম। দুজন এক ছাতাতে থাকার কারণে হালকা বৃষ্টিতে সব ভিজে গেল। ছাতা বন্ধ করে আমরা নির্জন পথে হাটতে লাগলাম।

বৃষ্টিভেজা তার শরীর। আমি তার শরীরের অংশ হালকা দেখতে পেলাম। বিকেলে বাসায় এলে খুশি হবো বলে সে বিদায় নিল।

বৃষ্টিতে ভিজে আমার জ্বর জ্বর লাগছে। তারপরও গেলাম তাদের বাসায়। কারণ তার প্রতি আমার কেমন জানি ভালোবাসা জন্মেছে। দরজায় নক করে অনেকক্ষণ দাড়িয়ে রইলাম। দরজা খুলে পলি বললো, আসুন, বসুন। বাসায় কেউ নেই, আমি চুলা থেকে ডালটা নামিয়ে আসি।

পলি বাসায় এসে শাদা পাঞ্জাবি পরেছে। তাও পাতলা, প্রায় অংশই দেখা যাচ্ছে। চুল ভেজা, ওড়না নেয়নি। হাতে একটি চিরুনি নিয়ে মাথা আচড়াতে আচড়াতে বললো, মনিরভাই, আপনাদের এসএসসি–র রেজাল্ট আর কতোদিন?

এই তো সামনে।

হঠাৎ তার হাত থেকে তার চিরুনিটা পড়ে গেল। পলি কাত হয়ে তুলতে গেলে আমিও তুলতে যাই। কিন্তু তার মুখের দিকে তাকাতেই চোখ গেল বুকের ফাকে যেখানে দিয়ে তার দুটি স্তন দেখা যাচ্ছে। সেদিকে তাকিয়ে রইলাম।

পলি বললো, কি দেখছেন?

বলবো? থাক। তারপর দাড়িয়ে তার হাত ধরে বললাম, আমি তোমাকে ভালোবাসি।

আমিও। বলে সে আমাকে জড়িয়ে ধরলো।

আমি তাকে জড়িয়ে ধরে সোফায় বসে পড়লাম।

সে বললো, আমাকে একটু আদর করো।

তাকে সোফা থেকে নিচে নামিয়ে শুয়ে দিলাম। বেড়ে দুজন গড়াগড়ি করতে লাগলাম। তার জামা খুলে দিলাম। সে আমার জামা খুলে দিল। তার ব্রা খুলে দিলাম। দুজনই হয়ে গেলাম অনাবৃত।

পলি আমার চুল ধরে তার স্তনের ওপরে ঘষছে আর বলছে, আমাকে চুমোয় চুমোয় ভরে দাও না।

আমি তার মুখে, গলায়, পেটে, উরুতে, পায়ে, সারা শরীর চুমোয় চুমোয় ভরে দিলাম। তারপর হারিয়ে গেলাম নতুন পৃথিবীতে। ক্লান্ত হয়ে গেলাম।

সে বললো, আরেকটু।

আবার শুরু করলাম। আবার ক্লান্ত হয়ে উঠে বসলাম সোফায়। পলিও বসলো। এবং কাদতে লাগলো।

বললো, কি করলাম।

বললাম, শক্ত করে বাধলাম ভালোবাসা আমাদের।

শরিয়তপুর থেকে

প্রকল্প

মেসবাহ

১৯৮৯ সালের ঘটনা। আমি তখন গাজীপুরে থাকি। আমার মাস্টার্স পরীক্ষা চলছিল। সেদিনও পরীক্ষা ছিল। জয়দেবপুর বাসস্ট্যান্ড থেকে ঢাকা যাওয়ার উদ্দেশ্যে একটা মিনিট বাসে উঠেছি। কিছুক্ষণের মধ্যেই বাস ভর্তি হয়ে গেল। প্রচুর লোক বাদুড় ঝোলার মতো রড ধরে দাড়িয়ে। বাসে তিল ধারণের ঠাই নেই। এক সময় বাস চলা শুরু করলো।

আমার এক সিট সামনে একজন পঞ্চাশোর্ধ লোক ছাতা হাতে বসেছে। হঠাৎ লক্ষ্য করলাম সিটে বসা লোকটি ছাতার বাটের মাথার উপর হাত রেখে আস্তে আস্তে তার অনামিকা প্রসারিত করে পাশে রড ধরে দাড়ানো লোকটির প্যান্টের ওপর দিয়ে বিশেষ অঙ্গ স্পর্শ করলো। দাড়ানো লোকটি আকস্মিকভাবে বিদ্যুৎ স্পৃষ্ট হওয়ার মতো লাফিয়ে উঠে দূরে সরে দাড়ালো। লোকটি ক্ষমা চাওয়ার উদ্দেশ্যে লজ্জিত ভঙ্গিতে ছাতা হাতে লোকটির দিকে তাকালো। সিটে বসা লোকটি নিমিষেই ছাতার বাট মুষ্টিবদ্ধ করে হাবাগোবা মানুষের মতো অন্যদিকে তাকিয়ে রইলো। ভাবখানা এমন যে, সে কিছুই জানে না।

প্রথমে মনে করেছি, আমি ভুল দেখেছি। সিটে বসা লোকটির অসাবধানতার কারণে হয়তো এমনটি ঘটেছে। কিন্তু না, একটু পরে সবই বুঝলাম। আসল ঘটনা হলো সিটে বসা লোকটি সুপরিকল্পিতভাবে অত্যন্ত অভিনব কায়দায় এই কাণ্ড করছে। এটা তার ছাতা প্রকল্পের কাজ। প্রকল্পের মূলধন হলো ছাতা। ছাতাই তার প্রকল্পের একমাত্র অবলম্বন। কারণ ছাতার বাটের ওপর হাত রেখে খুব সহজে সে অপকর্মটি করতে পারে। মুহূর্তের মধ্যে আঙুল গুটিয়ে প্রতিকূল অবস্থায় ভালো মানুষের ভান ধরতে পারে। অপরদিকে এই অপকর্মের জন্য ধরা পড়ে গেলে হয়তো বলবে, ছাতার ওপর রাখা হাত হঠাৎ করেই লেগেছে।

যখনই কোনো লোক তার ছাতা বরাবর আসছে তখনই সে আগের মতো একই অপকর্ম করে যাচ্ছে। আর প্রত্যেক লোকই তাদের বিশেষ অঙ্গে স্পর্শ লাগার সঙ্গে সঙ্গে লাফিয়ে উঠে দূরে সরে যাচ্ছে। তবে একজন লোককে দেখলাম, সে দূরে সরলো না। বরং একটু ঘনিষ্ঠ হয়ে ছাতাওয়ালা লোকটির পাশে দাড়ালো। ছাতাওয়ালা লোকটি নির্বিঘ্নে তার অপকর্ম চালিয়ে গেল।

অবশ্য কিছুক্ষণ পরই বাসের হেলপার উচ্চস্বরে দাড়ানো লোকটিকে বললো, দাদাভাই, একটু পেছনে সরেন, লেডিসরে জায়গা দেন।

লোকটি সরে যাওয়ার কারণে প্রকল্পের কার্যক্রম বন্ধ হয়ে গেল। এরপরও হয়তো অনেক লোক ছাতার পাশে দাড়িয়েছে এবং ছাতাওয়ালা লোকটি তার অপকর্ম চালিয়েছে। ঘৃণা লজ্জায় আর সেদিকে তাকাইনি। পৃথিবীতে এমন বিকৃত এবং কুরুচিপূর্ণ মানুষ আছে তা আমি এই ঘটনার আগ মুহূর্তেও

জানতাম না। একবার ভাবলাম, বাস ভর্তি মানুষের সামনে লোকটিকে অপমান করে উপযুক্ত শাস্তি দিই। কিন্তু পরক্ষণেই চিন্তা করলাম, লোকটির যে বয়স তাতে কোনো লোকই হয়তো আমার কথা বিশ্বাস করবে না। অভিযোগ প্রমাণ করতে না পারলে হয়তো উল্টো আমিই গণধোলাইয়ের শিকার হতে পারি। তাছাড়া সেই দিনটি আমার জন্য এতো গুরুত্বপূর্ণ যে, কোনো ঝামেলার কারণে ঢাকা পৌছাতে দেরি হলে জীবনে অপূরণীয় ক্ষতি হতো।

আমাদের দেশে যে হারে বিভিন্ন ধরনের ভুয়া প্রকল্প, সংস্থা বৃদ্ধি পাচ্ছে তাতে কথিত ছাতা প্রকল্পের সংখ্যা বৃদ্ধি পাওয়া অসম্ভব কিছুই নয়। তাই ছাতা প্রকল্প থেকে সাবধান!

সউদি আরব থেকে

কথকতা

প্রভাষ কুমার পাল

কোথায় যেন পড়েছিলাম :

অষ্ট দিক অষ্ট শিক মধ্যে দণ্ড শোভন

প্রণমি হে ছত্রদেব, ঝড়–বৃষ্টি বারণ।

ছাতা বিষয়ক ছড়াটির সঙ্গে হারিয়ে যাওয়া কিছু স্মৃতি মনে পড়লো। ছাতার কথা মনে হলে প্রথমেই মনে আসে ব্যাঙের ছাতার কথা। প্রাচীন কালে গৃসে বলা হতো, ঝড়–বাদলের রাতে মাটির গায়ে যে ফুসকুড়ি ওঠে সেটাই ব্যাঙের ছাতা। ষোড়শ শতকেও ধারণা ছিল, বজ্রপাতে মাটি ফুড়ে ব্যাঙের ছাতা গজায়। যদিও পরবর্তী কালে আবিষ্কৃত হয় ব্যাঙের ছাতা একপ্রকারের উদ্ভিদ তবুও ব্যাঙের ছাতা এতো দ্রুত বেড়ে ওঠার জন্যই বর্তমানেও প্রচলিত আছে বিখ্যাত প্রবাদ *ব্যাঙের ছাতার মতো গজিয়ে ওঠা।* আর হঠাৎ গজিয়ে ওঠা এই ব্যাঙের ছাতা ছোটবেলায় এমন এক ঘটনার জন্ম দিয়েছিল যা আজো আমাকে শিহরিত করে।

আমি তখন সাত আট বছরের। বাড়ির পেছনে খড়–বিচালির গাদার কিছু অংশ বৃষ্টিতে ভিজে পচে গেছে। খেলতে গিয়ে দেখি সেই পচা খড়ের গাদার ওপর বেশ বড় বড় সুন্দর ব্যাঙের ছাতা গজিয়েছে। সেগুলো এতো শাদা আর বড় ছিল যে সংগ্রহ করার লোভ হলো। তাছাড়া সেগুলো তুলতে পারলে অন্যদের কাছে নিজের কৃতিত্ব ও গ্রহণযোগ্যতাও বাড়বে। তাই সেগুলো নেয়ার জন্য গাদার কাছে

গেলাম। একটা কি দুটো তুলেছি হঠাৎ দেখি বড়সড়ো একটি ঢোড়া সাপ গাদার নিচ থেকে বের হয়ে আমার পায়ের কাছ দিয়ে চলে যাচ্ছে। এক লাফে চিৎকার করে কাদতে কাদতে বাড়িতে দৌড় দিলাম। কোথায় পড়ে রইলো সেই ব্যাঙের ছাতা! কাদতে এবং হাপাতে হাপাতে মাকে বললাম সব। মা তাড়াতাড়ি লবণ–জল খাইয়ে, অনেক আদর করে আমাকে থামালেন। পরবর্তী কালে ব্যাঙের ছাতা দেখলেই মনে পড়ে সেই ঘটনার কথা। এতো গেল ব্যাঙের ছাতার কথা। এবার বলবো ছাতা নিয়ে কিছু স্মৃতির কথা।

আমাদের পাড়ার বিধানদা সিজনাল পাগল। অর্থাৎ শীতকালে তার মাথা এলোমেলো হয়ে যায়। শিক্ষিত লোক। অতিরিক্ত পড়াশোনা করতে করতে নাকি পাগল হয়ে গিয়েছিলেন। চিকিৎসায় অনেকখানি ভালো হলেও পুরোপুরি সারেনি। তার মাথায় সমস্যা যখন হয় তখন তাকে দেখা যায় একটা ছাতা ও কিছু বই হাতে করে ঘুরে বেড়াতে। কখনো আপন মনে ইংরেজি কবিতা আবৃতি করেন আবার কখনো দেখা যায় বৃষ্টির মধ্যে ছাতা মাথায় দাড়িয়ে ধর্মীয় কোনো বই বা কবিতা উচ্চ স্বরে পড়ছেন। আরেকজন আছে যাকে সবাই *দুলাল পাগল* বলে ডাকে। তারও নিত্যসঙ্গী ছাতা। সব সময় সে ফ্যাকাশে কালো রঙ–এর একটা ছাতা সঙ্গে রাখে। পাড়ার দুষ্ট ছেলেরা তার বড় বড় জট পাকানো চুল আর বাকা লম্বা নখ কাটার জন্য পেছনে লাগলেই ছাতা নিয়ে তেড়ে যান। কখনো বা ছাতা মেলে ষাড়ের মতো এগিয়ে আসে। আবার মাঝে মাঝে দেখা যায় বৃষ্টির মধ্যেও ছাতা না মেলে নিজে ভিজতে ভিজতে যাচ্ছে। অথচ ছাতা ভেজাচ্ছে না। কেউ যদি বলে, দুলাল ছাতা মাথায় দিয়ে যাচ্ছ না কেন? ভিজে যাচ্ছ তো? দুলাল সঙ্গে সঙ্গে বলবে, *ছাতা ভিজালি শুকাতে দিলিই ওই ছোড়ারা আমার ছাতা নিয়ে যাবে। ওরা খুব বদ।*

এক বিহারি ভিক্ষুক আসে প্রতি সপ্তাহে। তার রঙ–বেরঙ–এর পট্টিমারা জামার সঙ্গে ছাতাটিও বিভিন্ন রঙ–এর কাপড়ের তালি দিয়ে সেলাই করা। সেই ছেড়া জীর্ণ ছাতা এক হাতে ধরে অন্যহাতে লাঠি নিয়ে আর কাধে ঝোলা ঝুলিয়ে এক বাড়ি থেকে অন্য বাড়ি ভিক্ষা করে। ছাতাটি রোদ–বৃষ্টি খুব বেশি একটা না ঠেকালেও দূর থেকে সেই ছাতা দেখেই সবাই চিনতে পারে বিহারি আসছে।

পাশের গ্রামে গফুর নামে এক ছাতা সারানোর লোক আছে। প্রতি হাটের দিন সে ছাতা সারার জন্য হাটের এক কোণে বসে। আর অন্যদিন গ্রামে গ্রামে ছাতা সেরে বেড়ায়। অথচ তার নিজের ছাতার কাপড়ে অসংখ্য ছিদ্রসহ দুই তিন জায়গায় বড় বড় ফুটো। কাঠের বাটওয়ালা সেই ছাতা মাথায় দিয়েই তিনি অন্যের ছাতা সারেন অথচ নিজের ছাতাটা সারা হয়ে ওঠে না।

ফটিকদা কেরানির চাকরি করেন। কিছুটা গল্প বিলাসী মানুষ কোথাও গল্পে বসে গেলে জমে যান। অন্য কোনো কিছু খেয়াল থাকে না। আর তারই মাশুল তিনি দিয়েছেন বেশ কয়টি ছাতা খুইয়ে। এখন সেই অভিজ্ঞতার ওপর নির্ভর করেই ছাতা বাদে চলাফেরা করেন। এমনকি অফিসেও যান ছাতাবিহীন ভিজতে ভিজতে। আবার মলয়কাকা মোঁপাসার বিখ্যাত চরিত্র মাদাম ওরেলি–র মতো ছাতা কৃপণ না হলেও কেউ ছাতা চাইতে গেলে শুনিয়ে দেন তার অনেকবার শোনানো ছাতা বিষয়ক উপদেশ, *বর্ষাকালে বৌ চাইলে বৌ দেয়া যায়। কিন্তু ছাতা দেয়া যায় না।*

মেজমামার ছাতা ছিল নিত্যসঙ্গী। বর্ষা শীত সব সময়ই বাকানো হাতলের ছাতাটি ছিল তার প্রিয়। সকালে বাম হাতে ছাতাটি ঝুলিয়ে বাজারের উদ্দেশ্যে বের হতেন প্রতিদিন। আত্মীয় বাড়ি বা কোনো অনুষ্ঠানে গেলেও ছাতা নিয়ে যেতেন একই কায়দায়। তার কাছে ছাতা ছিল স্টাইল।

একবার বর্ষাকালে বেশ কয়েকদিন ধরে বৃষ্টি হয়েছে। ছোটমামা বাজারে গিয়েছেন। সন্ধ্যার পর প্রচণ্ড বৃষ্টি! রাত দশটার দিকে বৃষ্টি কমলে মামা এলেন ছাতার মধ্যে অনেকগুলো কৈ মাছ নিয়ে। মা অতো রাতে কৈ মাছ দেখে অবাক। মামা জানালেন স্কুলের দুই পুকুরের পানি একাকার হয়ে রাস্তার ওপর পানি উঠে গেছে। রাস্তার ওপর থেকে ছাতা দিয়ে তিনি কৈ মাছগুলো ধরেছেন।

বাবার জন্য নির্দিষ্ট একটা ছাতা ছিল যেটা তিনিই ব্যবহার করতেন। অত্যন্ত প্রয়োজন ছাড়া আমরা সেই ছাতাটা ব্যবহার করতাম না। হঠাৎ এক বর্ষার দিনে নির্দিষ্ট জায়গায় ছাতাটি তিনি পেলেন না। সব জায়গাতে খোজা হলো। আমরা ভাইবোন কোথাও নিয়ে গিয়েছিলাম কি না তা শোনা হলো। আমরা অন্য ছাতা নিয়ে গিয়েছি। কিন্তু বাবারটা নিয়ে কোথাও যায়নি। বাবা মিলিয়ে দেখলেন যে, তিনিও কোথায়ও ছাতা ফেলে আসেননি। তাহলে নিশ্চয় বাড়ি থেকে কেউ নিয়ে গেছে। বাবা আমাদের সবাইকে অসাবধানতার জন্য বকা দিলেন। পরদিন শুক্রবার। শনিবারে বাবা অফিসে গেলেন। অফিসে গিয়ে দেখতে পেলেন ছাতাটা আলমারির ওপর রাখা। তখন বাবার মনে পড়লো কয়েকদিন আগে ছাতাটি তিনি অফিসেই রেখে গিয়েছিলেন, বাড়িতে নিয়ে যাননি।

ছোট বোন দুটি একবার বায়না ধরলো, তাদের ছাতা না কিনে দিলে তারা স্কুলে যাবে না। বাবা বাধ্য হয়ে দুজনের জন্য একজোড়া ছোটদের উপযোগী ছাতা কিনে দিলেন। ছাতা পেয়ে তারা খুব খুশি। প্রতিদিন স্কুলে যাওয়ার সময় ছাতা নিয়ে যায় আবার স্কুল থেকে এসে খুব যত্ন সহকারে ভাজ করে রাখে। কিছুদিন পরে বাড়িতে একটা ফোল্ডিং ছাতা এলো। এই ছাতা দুটোর কদর কমে গেল। দুজনেই ফোল্ডিং ছাতা নিয়ে কাড়াকাড়ি। ছোট বোন দুজনেই আজ কলেজের ছাত্রী। দুজনেই ফোল্ডিং

ছাতা ব্যবহার করে। অনেক জেদ, অনেক ভালোবাসা আর কষ্টের বিনিময়ে পাওয়া সেই ছোট ছাতা দুটি এখনো রয়ে গেছে সযত্নে।

মিরপুর, কুষ্টিয়া থেকে

আমব্রেলা বয়

উমর ফারুক

কলেজের প্রায় সকলের কাছেই মানিতার পরিচিতি *আমব্রেলা গার্ল* হিসেবে। কারণ বছরের সব ঋতুতে মানিতার হাতে একটি ছাতা থাকবেই। এ নিয়ে তাকে কতো খেপাতাম। *ছত্রকন্যা* বা *আমব্রেলা গার্ল* খেতাবেও ভূষিত করেছি। তার কোনো ভাবান্তর নেই।

আমি জন্ডিসে আক্রান্ত হলাম। এক মাস ভুগে সেরে উঠলাম। এখন গরম সহ্য হয় না একটুকুও। রোদের অল্প তাপেই মনে হয় শরীরটা পুড়ে যাচ্ছে। অবশেষে ছাতা কিনতে হলো। লোকে ছাতা কেনে বৃষ্টির হাত থেকে বাচতে। আর আমি কিনলাম রোদের উত্তাপ ঠেকাতে। আমার সার্বক্ষণিক ছাতা ব্যবহারে অন্য কেউ না হলেও মানিতা খুব খুশি। হয়তো ছাতা ব্যবহারকারী একজন সঙ্গী পেয়ে।

একদিন কলেজে মানিতা মুখোমুখি হলো। সহাস্যে জানতে চাইলো তার পথ ধরার কারণ। বিস্তারিত বললাম।

সে হেসে বললো, জন্ডিস শেষ পর্যন্ত আপনাকে *আমব্রেলা বয়* বানিয়ে ছাড়লো!

হ্যা! একটু একটু...। আমিও মুচকি হেসে জবাব দিলাম।

টাঙ্গাইল থেকে

নির্দোষ

মোহাম্মদ কামরুজ্জামান তোতা

ছুটির ঘণ্টা বেজে গেছে। হই হুল্লোড় করতে করতে ছাত্ররা ক্লাস থেকে বেরিয়ে গেল।

আষাঢ় মাস। আকাশে মেঘের ঘনঘটা প্রায় লেগেই আছে। সেদিনও বৃষ্টি ঝরছে অঝোর ধারায়। স্কুলের যেন সিড়ি ঘরের নিচে কিলবিল করছে ছাত্ররা। কেউ বা ছাতা নিয়ে রওনা দিচ্ছে বাড়ির উদ্দেশ্য, কেউ বা আবার বৃষ্টিতে ভিজে বই বগল দাবা করে দিচ্ছে দৌড়। আমি আছি বৃষ্টি থামার অপেক্ষায় আরো অনেকের মতো। বৃষ্টির যে ধরন তাতে থামার লক্ষণ নেই আরো অনেকক্ষণ। কি আর করি! দাড়িয়ে দাড়িয়ে দেখছি বৃষ্টির স্বর্গীয় ধারা।

অফিস থেকে আমাদের ক্লাস টিচার বের হলেন বাসায় ফেরার জন্য। সিড়ি ঘরের বর্ধিত করিডোরে তিনিও কিছুক্ষণ দাড়িয়ে রইলেন। আমরা স্যারকে দেখে একদিকে গুটিসুটি মেরে দাড়িয়ে রইলাম। বলে রাখা ভালো, স্যারের বাসা এবং আমাদের বাসা একই পাড়ায়।

বৃষ্টি থামার কোনো লক্ষণ না দেখে, প্যান্টের নিচের দিকটা কিছুটা উপরে উঠিয়ে বাড়ি যাওয়ার প্রস্তুতি নিলেন স্যার। যাওয়ার আগে আমাকে দেখে স্যার বললেন, জামান, বাসায় যাবে না?

বললাম, স্যার, আপনি যান আমি পরে যাবো। স্যারের হাতে ছিল ছাতা। তিনি ছাতা মেলে আমাকে আবারও ডাক দিলেন।

লজ্জা শরমের মাথা খেয়ে একই ছাতার নিচে স্যারের সঙ্গে গেলাম। স্কুল থেকে আমাদের বাসা বেশি দূরে নয় বলে খুব কষ্ট হয়নি।

পরের দিন। স্কুলে টিফিন পিরিয়ডে বন্ধুরা মিলে নানান রঙের গল্পে মশগুল। লিটন নামের বন্ধুটা হঠাৎ বলে উঠলো, দোস্ত তোর ভাগ্যটা বেশ ভালো।

তার কথার মাথামুণ্ডু কিছুই বুঝলাম না। বললাম, কি বলতে চাস খুলে বল?

ইশ! আর ন্যাকা সাজতে হবে না। একেবারে ভেজা বিড়াল। তবে যাই বলিস, আমাদের ক্লাস স্যারের মেয়েটা দারুণ। তোর সঙ্গে মানাবে বেশ।

আমাদের পাড়ার আরো কয়েকজন আমাদের সঙ্গে পড়তো। তাদের একজন বললো, তোরা আর কি কিছু জানিস? স্যারের মেয়ের সঙ্গে জামানের বিয়ে তো ঠিকঠাক হয়েই আছে। কালকে তোরা কিছু টের পেলি না, হবু জামাইয়ের প্রতি কতো দরদ। এতো বৃষ্টির মধ্যেও একই ছাতার নিচে পরম আদরে নিয়ে গেল।

বুঝতে পারলাম বন্ধুরা ঠাট্টার ছলে স্কুলের ভেতর গতকালের এই ঘটনাটি রাজ্যময় করে তুলেছিল। স্কুলে বন্ধুদের আড্ডায় এ নিয়ে ঠাট্টা মশকারা হতো প্রায়ই। কিন্তু বাদ সাধলো অন্য জায়গায়। আমাদের পাড়াতেও এ ব্যাপারটা ছড়িয়ে পড়লো। স্যারের কানেও গেল এ কথা। তার দৃঢ় বিশ্বাস, আমি ছড়িয়েছি এ কথা।

স্যার কেন জানি আমাকে ভীষণ ভালোবাসতেন। কোনো সমস্যা থাকলে দেখিয়ে দেয়ার জন্য বাসায় ডাকতেন। আমিও যেতাম মাঝে মাঝে।

প্রতিদিনই দরজা খুলে দিতো আমার এক ক্লাস নিচে পড়ুয়া স্যারেরই এক মেয়ে। দরজা খুলে দিয়েই খুব নরম সুরে একটা কথাই বলতো, বসুন। এর বেশি আর কিছু নয়। আমিও তাকে কোনোদিন কোনো কিছু বলতে পারিনি আমার লজ্জার কারণে।

সেদিন সন্ধ্যা বেলা ইংরেজির কিছু বিষয় দেখিয়ে দেয়ার জন্য স্যারের বাসায় গেলাম। প্রতিদিনের মতো সেদিনও দরজা খুলে দিল মেয়েটি। কিন্তু আমাকে দেখেই বসুন–টসুন তো দূরের কথা কোনো কিছু না বলেই গোমড়া মুখে এমন ভঙ্গিতে ভেতর ঘরে ঢুকলো যে, তাতেই আমার হার্টবিট শুরু হয়ে গেল। ব্যাপার কি! তবুও গুটিসুটি মেরে বসলাম স্যারের পড়ার ঘরে।

কিছুক্ষণ পর স্যার আসলেন এবং আমাকে দেখেই দাত কটমট করে উঠলেন, বেয়াদবের বাচ্চা, বের হও এখান থেকে। আমি কোনো কথাই বলতে পারলাম না। আসল ব্যাপারটা আংশিক আচ করতে পেরে বেরিয়ে এলাম নিচু মুখে।

অনেক সময় গড়িয়েছে। বৃষ্টির ঝরনা ধারাও থেমে থাকেনি। অনেক দিন হয়ে গেল ফার্মগেটের ফুটপাথ থেকে একটা ছাতা কিনেছি। এখনো বৃষ্টির সময় ছাতা মাথায় হাটলে মনে পড়ে যায় সেই গণ্ডিহীন স্কুল জীবনের কথা, স্যারের সেই ছাতার কথা, স্যারের মেয়ের কথা।

কিন্তু ব্যাপারটা নিয়ে কখনো নিজেকে অপরাধী ভাবিনি অন্তত এই ভেবে যে, আমাকে স্যার যাই ভাবুন, কিংবা আমাকে নিয়ে পাড়ায় যাই রটনা রটুক, আমার তো কেনো দোষ ছিল না।

চাপাইনবাবগঞ্জ থেকে

অধঃপতন

স্বপ্না

মিলা আমার ক্লাসমেট। আমরা একই কলেজে পড়ি। মিলা অত্যন্ত সুন্দরী। সবাই তাকে ভালোবাসতে চায়, পেতে চায়। কিন্তু আমার বিশেষ অনুরোধে বন্ধুরা তাকে পাওয়ার আশা ত্যাগ করে। মিলা ছিল শুধু আমার শয়নে–স্বপনে।

পড়ার টেবিলে শুধু তার কথাই কল্পনা করতাম। তাকে পাওয়ার জন্য পৃথিবীর যে কোনো কষ্ট মেনে নিতেও আমার কোনো আপত্তি ছিল না। সবাই জানতো মিলাকে আমি প্রচণ্ড ভালোবাসি। এ কথা আমি মিলাকে না বললেও কোনো এক বান্ধবীর কাছে মিলা জেনে গেল আমি তাকে ভালোবাসি। মিলা সেই থেকে আমাকে অবহেলা করতে লাগলো। কিন্তু তার মিষ্টি হাসি আর চাউনি আমাকে বিশ্বাস যোগাতো, হয়তো মিলাও আমাকে প্রচণ্ড ভালোবাসে। তার সঙ্গে প্রতিদিন দেখা হলেও কখনো তার সঙ্গে দীর্ঘক্ষণ কথা বলার সুযোগ হয়নি।

তার বাবা কলেজ শুরুর দশ মিনিট পরে তাকে কলেজে দিয়ে যেতেন। আবার কলেজ ছুটির পর তাদের ড্রাইভার এসে নিয়ে যেতেন। মাঝে মাঝে তার মাও কলেজে আসতেন।

একদিন ঝড় বৃষ্টিতে মিলা কলেজে আসেনি। তাই মনটা খুব খারাপ হয়ে গেল। জানি, আজ সব ক্লাস হবে না। আড্ডা আর গল্পগুজব করে কাটছিল সময়। ক্লাসের সবার পেছনের চেয়ারে বসে টেবিলে মাথা রেখে শুধু মিলার কথাই ভাবছিলাম। বাইরে প্রচণ্ড ঝড়বৃষ্টি হচ্ছে। কোনো ক্লাস হচ্ছে না। কেউ কেউ বাসায় চলে যাচ্ছে এমন সময় পেছন থেকে কে যেন কাধে হাত দিল। খুব দ্রুত পেছনে তাকালাম। না মিলা নয়। প্রিয়া খুব ভালো বন্ধু আমার। সে আমাকে ভালোবাসে। কিন্তু আমার মনপ্রাণ শুধু মিলার কথাই বলতো।

যাহোক, আমাকে প্রিয়া জিজ্ঞাসা করলো, স্বপ্ন বাসায় যাবে না?

না প্রিয়া, বাইরে বৃষ্টি। তার উপর আমার কাছে কোনো ছাতা নেই।

প্রিয়া বললো, আমার কাছে ছাতা আছে।

প্রিয়া ব্যাগ থেকে একটা ছাতা বের করলো। ছাতাটা খুব ছোট ছিল যা একজনের ব্যবহারের উপযুক্ত। এদিকে কলেজের সব ছাত্রছাত্রী প্রায় চলে যাচ্ছে। এখন আর কোনোভাবেই কলেজে থাকা যায় না। দুইজনে ছোট্ট ছাতার নিচে আস্তে আস্তে হাটছি। অনেকক্ষণ হাটার পর একটা রিকশা পেয়ে গেলাম। দুইজনে আটসাট হয়ে বসে আছি। দুজনের জামা–কাপড়ই ভিজে গেছে। ভেজা কাপড়ে প্রিয়াকে খুব সুন্দর লাগছিল।

এক সময় প্রিয়াদের বাসায় চলে গেলাম। বাসায় কেউ নেই। তাকে জিজ্ঞাসা করতেই বললো, মা–বাবা গ্রামের বাড়িতে গেছেন বিয়ে খেতে। সামনে পরীক্ষা। তাই আমি যাইনি। এরই মধ্যে আমাকে একটা টাওয়েল দিয়ে বললো, গোসল করবে স্বপ্ন?

হ্যা সূচক উত্তর দিয়ে সোজা বাথরুমে চলে গেলাম। বাথরুমে গিয়ে কাপড় পরিবর্তন করছিলাম। এমন সময় সাবান নিয়ে প্রিয়াও বাথ রুমে গেল। কিন্তু আশ্চর্য রকমের লজ্জা পেয়ে প্রিয়া বাথরুম থেকে বের হয়ে গেল। লজ্জায় আমিও লাল হয়ে গেলাম। গোসল সেরে প্রিয়ার সামনে লজ্জায় চোখ তুলে তাকাতে পারছিলাম না। প্রিয়াকে বললাম, চলে যাচ্ছি।

কিন্তু প্রিয়া দৌড়ে দরজার সামনে দাড়ালো। তারপর বললো, আমার চোখের দিকে তাকাও।

অনেক কষ্টে লজ্জা ভেঙে তার দিকে তাকালাম। তার লজ্জা ভরা চোখ আর মিটি মিটি হাসি দেখে নিজেকে সামলে রাখতে পারলাম না। প্রচণ্ড ভালোবাসায় প্রিয়াকে জড়িয়ে ধরলাম।

সেদিন আর বাসায় ফেরা হয়নি। সারা রাত প্রিয়ার ভালোবাসা উপভোগ করেছিলাম। সেই থেকে প্রিয়ার সঙ্গে ফৃ হওয়া এবং নিয়মিত যৌন অপারেশন করা।

মিলাকে না পাওয়ার যন্ত্রণায় আজ আমি নিঃস্ব, অসহায়। এসএসসি–তে অল্পের জন্য স্ট্যান্ড না করা ছেলেটি লেখাপড়ার পাট চুকিয়ে আজ পরবাসে প্রেম যন্ত্রণায় ভুগছে। সেই যে প্রিয়ার ছাতা যার জন্য আমার এ অবস্থা। সেদিন যদি প্রিয়ার ছাতাটি না থাকতো তাহলে তার সঙ্গে আমার ঘনিষ্ঠতা হতো না, আমিও নরম মাংসের স্বাদ পেতাম না, এতোটা অধঃপতনও আমার হতো না। হায়রে ছাতা!

সউদি আরব থেকে

বৃষ্টিপ্রীতি

রচনা

ছাতা শুধু রোদ–বৃষ্টি থেকে রক্ষা করা ছাড়া আরো যা করে তা হলো, গ্রামের মহিলারা ছাতা দিয়ে মুখ ঢেকে পর্দা রক্ষা করে। কেউ কেউ আবার কারো থেকে এড়িয়ে চলতে চাইলে ছাতা দিয়ে ঢেকে দিব্যি সামনে দিয়ে পার হয়ে যান। আর একটা কমন দৃশ্য যেটা গ্রামে দেখা যায় সেটি হলো ছাতা দিয়ে ঢেকে প্রাকৃতিক কর্ম সম্পাদন করা। অন্যজনে ধরা ছাতা মাথায় দিয়ে চলা সম্মানেরও ব্যাপার। গ্রামে সামান্য মাতব্বর থেকে শুরু করে প্রধানমন্ত্রীর মাথা পর্যন্ত ছাতা ধরতে দেখা যায়।

মার্কা হিসেবেও বহুল প্রচলিত। *ছাতা মার্কায়* ভোট দিয়ে ডা. করিমউল্লাহ সাহেবকে জয়যুক্ত করুন। স্লোগানের এই ডা. করিমউল্লাহ সাহেব হলেন আমার বড়চাচা। তবে এলাকাবাসী তার এই উদাত্ত আহ্বানে সাড়া দেয়নি। নির্বাচনে তিনি শোচনীয়ভাবে পরাজিত হয়েছেন। কাকার ভাষায় এ *দেশে যোগ্য লোকের কদর নেই*। হয়তো বা তাই। তবে সে সময় যা হয়েছিল তা হলো, পুরো বাড়িতে আমরা সব ভাই বোন মিলে ছাতা একে ছাতায় ছাতায় ছাতাময় করে ফেলেছিলাম। আমি প্রথম যে জিনিসটি আকতে শিখেছি সেটি হলো ছাতা। ছোটবেলায় আমার ছাতা আকতে উৎসাহের কোনো কমতি ছিল না।

ছাতা আকতে উৎসাহ বোধ করলেও এখন ছাতা ইউজ করতে আমাকে নিরুৎসাহিত হতে হচ্ছে। বৃষ্টিতে ছাতা ব্যবহার করাটা নিয়ম হলেও রোদে ছাতা ব্যবহার করাটা কিছুটা বিব্রতকর, অন্তত আমার ক্ষেত্রে রোদের জন্য ছাতা ব্যবহার করাটা কতোটা জরুরি তা বলার অপেক্ষা রাখে না। রোদে ছাতা নিয়ে রাস্তা দিয়ে যাবার সময় আমাকে যা শুনতে হয়, তা হলো *ছাতাওয়ালি, রোদে ব্ল্যাক হয়ে গেলাম* কিংবা *বৃষ্টিতে ভিজে গেলাম* অথবা *মিস আমব্রেলা* এ রকম অসংখ্য কমেন্ট।

এদিকে রোদে ছাতা ব্যবহার করাটা এমন এক অভ্যাসে দাড়িয়েছে যে, আমার কেন জানি মনে হয় ছাতা শুধু রোদের জন্য। বাসা থেকে বের হবার সময় যখন আকাশ মেঘলা দেখি তখন ছাতা নেই না

তখন আমার মনে হয়, থাক, আজ তো রোদ ছাতার কি দরকার। অথচ কিছু দূর যাবার পর দেখা যায় ঝুম বৃষ্টি। একেবারে ভয়াবহ অবস্থা হয়। তখন ভিজে একাকার।

কয়েক মাস আগে আমার নতুন ছাতাটা দুদিনের মাথায় হারিয়ে যায়। সবার ধারণা, ভুলে বাইরে রেখে এসেছি। কিন্তু আমি নিশ্চিত এটি বাসা থেকে হারিয়েছে। কে শোনে কার কথা। নতুন ছাতা হারানোর পানিশমেন্ট স্বরূপ আমাকে এ বছর আর কোনো ছাতা কিনে দেয়া হবে না। আমার পানিশমেন্ট হৃষ্টচিত্তে মেনে নিয়েছি। তবে মনের মধ্যে খুত খুত করছে, এখন তো না হয় বর্ষাকাল, বাচা গেল। আমার আবার বৃষ্টিপ্রীতি রয়েছে। কয়েকদিন পরে যে প্রচণ্ড রোদ শুরু হবে, তখন কি হবে?

উত্তর আগ্রাবাদ, চট্টগ্রাম থেকে

আন্দাজে ঢিল

রাজীব আহমেদ

বছর খানেক আগের ঘটনা। আমাদের ক্লাসের ফার্স্টবয় মিল্টন বেশ নিরিবিলি এবং সুবোধ ছেলে। তাকে নিয়েই ঘটনা। মিল্টনের সার্বক্ষণিক সঙ্গী হলো উজ্জ্বল। মিল্টনকে অনুকরণ এবং অনুসরণ করে একটা ফাটাফাটি রেজাল্ট করার ইচ্ছা উজ্জ্বলের। কিন্তু দুঃখের বিষয়, তার রেজাল্টের অবস্থা খুবই খারাপ।

একদিন মিল্টন ও উজ্জ্বল আমার রুমে এলো। আশপাশের রুম থেকে আরো কয়েকজন আসাতে আড্ডা জমে উঠলো।

এক পর্যায়ে মিল্টন বললো, ক্লাস রুমে আমি একটা ছাতা পেয়েছি।

আমি আন্দাজে ঢিল ছুড়ে মারলাম। বললাম, দোস্ত, আমার একটা ছাতা হারানো গেছে। তাহলে ছাতাটা বোধহয় আমারই। উজ্জ্বল বললো, তোর আবার ছাতা ছিল কবে?

আমি দুঃখী দুঃখী ভাব করে বললাম, বড় ভাইয়া ছাতাটা আমাকে প্রেজেন্ট করেছেন। সেদিন বৃষ্টির দিনে ক্লাসে ফেলে এসেছি।

মিল্টন খুশি হয়ে বললো, হ্যা হ্যা, বৃষ্টির দিনেই ছাতাটা পেয়েছি।

আসলে আমি মেরেছিলাম আন্দাজে ঢিল। ছাতা কারো হারালে সাধারণত বৃষ্টির দিনেই হারাবে। কারণ বৃষ্টির দিনেই বেশির ভাগ ছেলে ছাতা নিয়ে ক্লাসে আসে। রোদের জন্য যারা ছাতা ব্যবহার করে তারা সারা বছরই ছাতা নিয়ে ক্লাসে আসে, তারা সাধারণত ছাতা ফেলে রেখে যাবে না।

আমার রুমমেট ইমন দেখি মিটিমিটি হাসছে। কারণ সে জানে আমার আসলে কোনো ছাতাই নেই। আমি তার দিকে চোখ টিপে দিলাম। সে কি মনে করে বললো, ছাতাটা খুব সুন্দর ছিল, কালো রঙয়ের।

ছাতার রঙ তো কালো হওয়াই স্বাভাবিক। কিন্তু এই কথা শুনে মিল্টনের আর কোনো দ্বিধা রইলো না। সে পুরোপুরি নিশ্চিত হয়ে গেল যে, ছাতাটা আমার। ব্যাগের ভেতর থেকে ছাতাটা বের করে আমার হাতে সে দিল।

পরের দিন ক্লাসে যাবার আগে ভীষণ বৃষ্টি শুরু হলো। ছাতা হাতে ক্লাসে ঢুকতেই সোনিয়া সামনে এসে দাড়ালো। বললো, তুই একটা ফাজিল। ফাজলামো করার আর জায়গা পেলি না। মিল্টন আমার ছাতা পেয়েছে, তার কাছ থেকে তুই ছাতাটা নিয়েছিস কেন?

আমি সরি বলতে বলতেই সোনিয়া আমার হাত থেকে ছাতাটা নিয়ে নিল। এই মেয়েটাকে আমার সব কিছুই দিয়ে দিতে ইচ্ছা করে, ছাতা তো তুচ্ছ জিনিস।

ময়মনসিংহ থেকে

বদল

অপালা

প্রায় আট বছর আগের কথা। আমার মেজবোনের বিয়ের পর দুলাভাই অফিসের কাজে প্যারিস চলে গেলেন। এরই মধ্যে আমার মেজবোন ডিগ্রি পরীক্ষা দিল। এক বছর পর দুলাভাই দেশে ফিরলেন। তিনি মেজবোনকে নিয়ে যেতে এসেছেন। সারাদিন খুব হই চই করলাম। বিকেলের দিকে আপাকে নিয়ে চলে গেলেন।

কয়েকদিন পর আমাদের বাসায় বেড়াতে এলেন। আমাদের সবাইকে নিয়ে চায়নিজ খাওয়ার পর বিকেলে বাসায় এসে ড্রইং রুমে বসেছি। দুলাভাই চলে যাবে বলছে। এমন সময় শুনি মুষলধারে বৃষ্টি পড়ার শব্দ। আমরা দুই বোন দৌড়ে ছাদে গেলাম। শুকনো কাপড়-চোপড় বৃষ্টিতে ভিজে গেল। সেগুলো নিয়ে বারান্দায় রেখে আমরাও ভিজে কাপড় পাল্টে সবার জন্য চা বানিয়ে ড্রইং রুমে নিয়ে গেলাম। সবাই চুপচাপ চায়ের কাপ হাতে তুলে নিল। বৃষ্টির সঙ্গে দমকা বাতাস শুরু হয়ে গেল। দুলাভাই চায়ের কাপ নামিয়ে রেখে বাসায় ফোন করে তার মায়ের কাছে বলেন, মা, আমি বৃষ্টির জন্য আসতে পারছি না। বৃষ্টি থামলেই চলে আসবো, চিন্তা করো না।

পরের দিন খুব সকালে আমার সেজবোন আমাকে ঘুম থেকে উঠিয়ে দিয়ে সে গিয়ে বাথরুমে ঢোকে।

আমি বিছানায় বসেই জানালার পর্দা সরিয়ে দেখি মুষলধারে বৃষ্টি হচ্ছে। এক লাফে বিছানা থেকে নেমে ডায়নিং রুমে ঢুকে দেখি দুলাভাই চা খাচ্ছেন।

মা আমাকে দেখেই বললেন, যা, তোর আব্বার ছাতাটা নিয়ে আয়।

আমি আব্বার ছাতাটা দুলাভাইকে দিতেই তিনি ছাতাটা হাতে নিয়ে উঠে দাড়ান। সবার কাছ থেকে বিদায় নিয়ে চলে গেলেন। দরজাটা বন্ধ করেই বাবাকে বললাম, বাবা, তোমার শখের ছাতাটা দিলে?

হ্যা কি আর করা যাবে।

হু, ঠিকঠাক মতো ফিরিয়ে আনলেই হবে। বলেই ভেতরে চলে গেলাম।

কয়েকদিন পর দুলাভাই এলেন আপাকে নিয়ে যেতে। আমি মায়ের সঙ্গে বেড়াতে গিয়েছিলাম। বাসায় এসে শুনি মেজবোনকে নিয়ে চলে যাচ্ছেন দুলাভাই।

আমি ড্রইং রুমে ঢুকতেই বললেন, এই যে তোমাদের ছাতা।

বললাম, একি, এ যে ছাতা বদল হয়ে গেছে।

দুলাভাই বললেন, সেদিন অফিসে ছাতাটা আমার রুমে রেখে দরকারি কিছু ফাইল নিয়ে বসের রুমে গেলাম। দশ মিনিট পর এসে দেখি ছাতাটা যেখানে রেখে গিয়েছিলাম সেখানে নেই। অনেক খোজাখুজি করেও ছাতাটা পাওয়া গেল না। বিকেলে বৃষ্টিতে ভিজেই গাড়িতে উঠলাম।

দুলাভাই চলে গেলে আমি ছাতাটা নিয়ে আব্বার কাছে গেলাম। তাকে সব খুলে বললাম।

আব্বা বললেন, আমার চাকরি জীবনে ইওরোপের প্রায় সবগুলো দেশ ঘুরেছি। প্রথম যখন আমার লন্ডন পোস্টিং হয় তখন এই ছাতাটা কিনেছিলাম। এ ছাতার সঙ্গে আমার অনেক স্মৃতি জড়িয়েছিল বলেই আব্বা একটা দীর্ঘশ্বাস ফেললেন। আব্বার এই ছাতাটা আমাদের পরিবারে সবার খুব পছন্দের ছাতা ছিল।

ঢাকা থেকে

খাবনামা

আবিদুর রেজা রিপন

চলতি বছরের শুরু থেকেই অনিয়মিতভাবে একটি স্বপ্ন দেখে আসছি। স্বপ্নের বিষয়বস্তু খুব সরল। কিন্তু আমার কাছে এর অর্থ ক্রমেই জটিল হয়ে উঠছে।

একটি শাদা ছাতা। বাংলাদেশি হাজিরা যেমন ছাতা ব্যবহার করেন অনেকটা তেমন। কোনো রাতে দেখতে পাই ছাতাটি মাথায় দিয়ে উদ্দেশ্যহীনভাবে হেটে চলেছি। আবার কোনো রাতে দেখতে পাই ছাতাটি আসলে আমার নয়, এর প্রকৃত মালিককে ফিরিয়ে দেয়ার জন্য খুজছি। কিন্তু পাচ্ছি না।

সাহিত্যের ছাত্র হিসেবে অলৌকিক কিছুতে বিশ্বাস করি না। এই হিসেবে স্বপ্ন নিয়েও কখনো আমার মাথা ব্যথা ছিল না। কিন্তু মাস দুই একই স্বপ্ন বার বার দেখার পর স্বপ্নের ব্যাখ্যা ভালোভাবে দেয়া আছে এমন বই হন্যে হয়ে খুজতে লাগলাম।

অবশেষে নীলক্ষেত থেকে একটি পুরনো *সোলেমানি খাবনামা* কিনলাম। তন্নতন্ন করে খুজেও আমার স্বপ্নের ব্যাখ্যা খুজে পেলাম না। অবশেষে কয়েকজন ঘনিষ্ঠ বন্ধুকে ঘটনাটা খুলে বললাম।

প্রথমেই এক ধার্মিক বন্ধু তার পরিচিত এক হুজুরের কথা জানালো যিনি জিন–পরী পোষেন এবং দুঃস্বপ্ন বিষয়ে বিশেষজ্ঞ। সে বললো আসছে বৃহস্পতিবার হুজুরের কাছে নিয়ে যাবে। কেননা শবে জুমার রাত খুব পবিত্র। হুজুর সে রাতে স্বপ্নের ব্যাখ্যা দিতে স্বাচ্ছন্দ বোধ করেন। কথামতো সেই রাতেই হুজুরের কাছে আমার খোয়াবনামা বয়ান করলাম।

তিনি আমার দিকে মায়াময় দৃষ্টিতে তাকিয়ে প্রশ্ন করলেন, তোমার পেশা কি?

বললাম, ঢাকা ইউনিভার্সিটিতে পড়ি।

শুনেই তিনি বিরক্তি ভরা মুখে বলে উঠলেন, নাউজুবিল্লাহ, এখানে ইমান নিয়ে গেলে তো ইমান বিক্রি হয়ে যায়। কিছুদিন আগে প্রয়াত নজরুল সাহেবের (কবি নজরুল) মাজার জেয়ারত করতে গিয়েছিলাম। কিন্তু গিয়ে দেখি সব নাজায়েজ কাজ কারবার। বেগানা নারী–পুরুষ লজ্জা–শরমের মাথা খেয়ে হাতে হাত রেখে মাজারের নিচেই বসে আমোদ–আহ্লাদ করছে। মাজারের পাশেই যদি এ অবস্থা হয় তাহলে এর বাইরে না জানি কি হয় বলেই দীর্ঘশ্বাস ছাড়লেন। এসব নাজায়েজ জিনিস দেখতে দেখতে আপনার মতো নওজোয়ানদের মাথা খারাপ হয়ে গেছে।

স্বীকার করতে বাধ্য হলাম, ঢাকা ইউনিভার্সিটি চত্বরে বসে থাকা বেহায়া জুটিদের কথা তিনি মিথ্যা বলেননি। এরা করবস্থানের মতো নির্জন জায়গার পবিত্রতাকেও কলুষিত করে তুলেছে।

আমি মোলায়েম সুরে জানতে চাইলাম, হুজুর, এ থেকে মুক্তির উপায় কি?

উত্তরে তিনি বললেন, যেদিকে সেদিকে তাকানো যাবে না। রাস্তাঘাটে চলার সময় দোয়া দরুদ পড়বেন।

কি দোয়া পড়বো জিজ্ঞাসা করতেই বললেন, যা জানেন তাই–ই পড়বেন।

তার সঙ্গে আর কথা না বাড়িয়ে সালাম দিয়ে চলে এলাম। আমার দৃঢ় বিশ্বাস, তার সঙ্গে আরো কিছুক্ষণ কথা বললে হয়তো বলেই ফেলতেন, ঢাকা ইউনিভার্সিটি না ছাড়লে আমার এ দুঃস্বপ্ন ছাড়বে না।

পরদিন রাতে আবার একই স্বপ্ন দেখলাম। মন উসখুস করতে লাগলো। আরেক বন্ধু পরামর্শ দিল কোনো জ্যোতিষীর পরামর্শ নিতে। দুদিন পর ঢাকার এক বিখ্যাত জ্যোতিষীর চেম্বারে গেলাম। সঙ্গত কারণে তার নামটি বলছি না। আমার কথা শোনার পর সে যা বললো তার অর্থ মোটামুটি এই রকম – বুধের প্রভাব পড়েছে, আপনার কোনো অভিভাবক আপনাকে ছাতার মতো ঝড়–বৃষ্টি থেকে রক্ষা করে চলেছেন। গ্রহের প্রভাবে তিনি বিরূপ হলে আপনার জন্য সমস্যা হবে ইত্যাদি।

সমাধান দিলেন পাথর ব্যবহারের জন্য। ওই পাথরের দাম শুনেই মাথার ঘিলু গরম হয়ে গেল। এমনিতে দাম পাচ হাজার টাকা, ছাত্র বলে আমার জন্য সর্বোচ্চ এক হাজার টাকা ছাড় দেবেন। পরে নেবো বলে বের হয়ে এলাম।

কেটে গেল আরো কিছুদিন। কিন্তু এভাবে আর চলছিল না। কেননা সাময়িক বিরতির পর আবার একই স্বপ্ন দেখতে লাগলাম। বন্ধুরা শুনলে হাসাহাসি করবে এ জন্য তাদের না বলে একজন লব্ধপ্রতিষ্ঠ মনোরোগ চিকিৎসকের কাছে গেলাম। বর্ণনা শুনে তিনি বললেন, আমার কোনো শাদা জিনিসের প্রতি দুর্বলতা আছে কি না বা কোনো শাদা রঙের পোষা বিড়াল, খরগোশ, ভেড়া বা কবুতর ছিল কি না যা মারা গেছে অথবা চুরি হয়েছে।

আমি স্মৃতি হাতড়ে কোনো প্রিয় পশু পাখি পেলাম না।

তিনি একটু চিন্তিত হলেন। পরক্ষণেই উৎসাহের সঙ্গে বললেন, আচ্ছা, আপনি কি কারো কাছ থেকে কোনো শাদা জিনিস ছিনিয়ে নিয়েছিলেন? হতে পারে সেটা ফর্শা কোনো মুখ। বর্তমানে কাজটির জন্য আপনি অনুতপ্ত এবং জিনিসটি তার প্রকৃত মালিককে ফিরিয়ে দিতে চাইছেন। কিন্তু পারছেন না।

আমি তার ইঙ্গিত বুঝতে পেরে বললাম, এমন কোনো ঘটনা ঘটাইনি। দ্বিতীয়ত. আজ পর্যন্ত কারো কোনো ক্ষতি করিনি, বরং অনেকেই আমার ক্ষতি করার চেষ্টা করেছে।

সবশেষে তিনি বললেন, আপনি নিশ্চয়ই কোনো মানসিক চাপে ভুগছেন যা আমাকে বলছেন না।

স্বপ্নটিই যে আমার মানসিক চাপের কারণ সেটা তাকে বোঝাতে পারলাম না।

টেনশন ফৃ জীবন যাপনের পরামর্শ দিয়ে আমাকে তিনি বিদায় করলেন।

মাঝে তাকে প্রশ্ন করেছিলাম। কেন বার বার শুধু শাদা ছাতার স্বপ্নই দেখছি?

তিনি উত্তরে বলেছিলেন আপনার হয়তো জানা নেই, তবে এটাই সত্যি স্বপ্ন সব সময় শাদা–কালো হয়। রঙিন স্বপ্ন কেউ কোনোদিন দেখেনি। যেহেতু কালো রঙের ছাতা দেখছেন না সেহেতু শাদা ছাতা দেখছেন, লাল, সবুজ বা হলুদ নয়।

তার এ কথাগুলো আমার পছন্দ হয়েছিল। কিন্তু আজো ক্রমাগত একই স্বপ্ন দেখে যাচ্ছি। সুপ্রিয় পাঠকবৃন্দ যদি কারো কাছে এর ব্যাখ্যা থেকে থাকে তাহলে ঢাকা ইউনিভার্সিটি ইংরেজি বিভাগের ঠিকানায় অনুগ্রহ করে সমাধান পাঠালে আজীবন কৃতজ্ঞ থাকবো। কেননা শাদা ছাতা নিয়ে আমি সত্যিই উদ্বিগ্ন।

ঢাকা ইউনিভার্সিটি থেকে

চিরন্তন প্রথা

আজম মিজান

আমাদের বংশে ছাতা ব্যবহারের একটি চিরাচরিত রীতি চালু আছে। ছোটবেলা থেকেই দেখে আসছি আমাদের বাড়িতে সাধারণ কোনো লোক ছাতা নিয়ে প্রবেশ করে না। শুধু আমাদের একদম কাছের আত্মীয় কিংবা কোনো সম্ভ্রান্ত সৈয়দ, খন্দকার বা সাহেব বংশীয় লোকদেরই আমাদের বাড়িতে ছাতা মাথায় দিয়ে আসতে দেখেছি।

প্রথাগতভাবে আমাদের পূর্বপুরুষরা সাহেবী হালে দিন যাপন করে আসছেন। তারা যখন ছাতা ব্যবহার করতেন তখন গ্রামের লোকদের জন্য ছিল তা নিষিদ্ধ। আমার আব্বা একজন পীর সাহেব। ইজিপ্টের আল আজহার ইউনিভার্সিটি থেকে গ্র্যান্ড মুফতি–র সনদ লাভ করেছেন। উচ্চ শিক্ষার আলোয় আলোকিত আমার আব্বা সকল রক্ষণশীল প্রথা ও ধর্মীয় কুসংস্কারের বিরুদ্ধে উচ্চকিত হয়ে উঠলেন। ভেঙে দিতে লাগলেন কুখ্যাত সব দুর্গ, বংশ প্রথা।

তারপরও গ্রামের মানুষ ভয়ে আব্বার সামনে কখনো ছাতা মাথায় দিয়ে আসেনি। কেউ যদি কখনো ভুলেও ছাতা মাথায় আব্বার মুখোমুখি পড়ে যায় তখন মাথার ওপর থেকে ছাতাটা নামিয়ে বগলদাবা করে বলতে দেখেছি, *বেয়াদবি হয়ে গেছে হুজুর, মাফ করবেন।*

আব্বা তখন অবাক হয়ে বলতেন, তোমাদের মনোভাব এখনো পরিবর্তন হলো না, রোদে পুড়ে, বৃষ্টিতে ভিজে সম্মান প্রকাশের কোন রীতি এটা?

একটু একটু করে রোপিত প্রথার শিকড় কি এক টানে উপড়ে ফেলা যায় সাহেব...! ঠিক এমনই বক্তব্য ও বিশ্বাস গ্রামের মানুষের।

আব্বার সঙ্গে যখন কোনো মুরিদানের বাড়িতে বেড়াতে যাই তখন প্রায়ই দেখি মুরিদানরা ছাতা হাতে দৌড়ে এসে আমাদের মাথায় মেলে ধরে পথ থেকে এগিয়ে নিয়ে যায়। তাতে আমার অস্বস্তি লাগলেও মুরিদানরা এই নিয়ম–শৃঙ্খলার বিরুদ্ধে অবস্থান নিতে পারে না। কারণ তাদের বিশ্বাস, পীর ও পীরের আওলাদের মাথায় ছাতা ধরলে রোজ কেয়ামতের ময়দানে পীরের ছাতার নিচে তাদের জায়গা হবে।

শ্রীমঙ্গল থেকে

পাচালি

কায়সার খান

ছোটবেলায় যখন এ,বি,সি,ডি শিখে প্রথম ওয়ার্ড লেখা শুরু করেছিলাম তখন ছাতার ইংরেজি Umbrella লিখতে কষ্ট হতো। বার বার e-এর স্থানে a লিখে ফেলতাম। তাই ছাতার ওপর খুব রাগ হতো। এরপর যখন স্কুলে ভর্তি হলাম তখন ছোট্ট ছাতা ব্যবহার করতাম। তখন নিজেকে বড় মনে হতো। এভাবে ছাতাকে ভালোবেসে ফেলেছিলাম। এ ভালোবাসায় হারিয়ে গিয়েছিল প্রথম জীবনের রাগ–এর অর্থ। উল্লেখ্য, সংস্কৃত *রাগ* শব্দের অর্থ *ভালোবাসা।*

অর্থনৈতিক সূচক

একটি দেশের অর্থনৈতিক অবস্থা বুঝতে জিডিপি–র প্রবৃদ্ধির হার, জিএনপি, মুদ্রাস্ফীতি, সঞ্চয়ের হার, বৈদেশিক মুদ্রার হার, আমদানি–রফতানির বৈষম্য ইত্যাদি তথ্যের প্রয়োজন হয়। কিন্তু বাঙালি সমাজে শুধু একটি সূচক ছাতার মাধ্যমেই অর্থনৈতিক অবস্থা বোঝা যায়।

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের আষাঢ় মাসে লেখা বিখ্যাত কবিতা *বাঁশি*–র হরিপদ সদাগরি অফিসের পচিশ টাকা বেতনের কনিষ্ঠ কেরানি। সে থাকে কিনু গোয়ালার গলিতে। দোতলা বাড়ির লোহার গরাদ দেয়া একতলা ঘর। লোনা ধরা দেয়াল। তার একমাত্র রুমমেট একটি টিকটিকি। প্রাইভেট টিউশনির দক্ষিণা হলো তার খাবার। হরিপদ কেরানি শেয়ালদা স্টেশনে সন্ধ্যা কাটায় আলো জ্বালানোর খরচ বাচানোর জন্য। ঘনঘোর বর্ষায় ট্রামের খরচ বৃদ্ধি পায়। মাঝে মাঝে বেতন কাটা যায়। তার ছাতার অবস্থা রবীন্দ্রনাথের ভাষায় :

ছাতার অবস্থাখানা জরিমানা দেয়া

মাইনের মতো

বহু ছিদ্র তার।

বাহারি ছাতা

রোমান্টিক ব্যক্তিরা বলেন, ঈশ্বরের শ্রেষ্ঠ সৃষ্টি হলো নারী। আবার নারীদের জন্যই সব সুন্দর সৃষ্টি। এ কথা প্রমাণ করার জন্যই রঙ–বেরঙের বাহারি ছাতাগুলোর ওপর নারীর অধিকার একচেটিয়া। ট্রাফিক পুলিশের ভাগ্যে শাদা এবং পুরুষদের ভাগ্যে কালো ছাতা জোটে। তবে জনপ্রিয় ঔপন্যাসিক হুমায়ূন আহমেদ–এর *কবি*–র নায়ক আতাহার পুরুষদের বাহারি ছাতা ব্যবহারের পক্ষপাতী। তার যুক্তি হলো, মেয়েদের সঙ্গে নিয়ে যদি রাস্তায় হাটতে পারি তাহলে মেয়েদের ছাতা হাতে হাটতে অসুবিধা কি। বৃষ্টি হবে কি না সেটাই হলো বিবেচ্য।

অভিনয়ে ছাতা

মঞ্চ ও টিভি নাটক এবং সিনেমায় মাতব্বর চরিত্রের জন্য ছাতা অপরিহার্যভাবে উপস্থাপিত হয়। মাতব্বর ও ছাতা একে অপরের পরিপূরক। মাতব্বরের চামচা শ্রেণীর একজন ছাতাটি বহন করে থাকে। তবে সবক্ষেত্রেই দেখা যায়, মাতব্বরের পরিবর্তে চামচার মাথায়ই ছাতা থাকে। ঘটক চরিত্রের ছাতা কখনোই মেলানো অবস্থায় থাকে না। প্রতিক্ষেত্রেই দেখা যায়, ঘটকের বাম বগলের নিচে ছাতাটি থাকে।

নির্বাচনী প্রতীক

ছাতা একটি আদর্শ নির্বাচনী প্রতীক। আসল ছাতা অর্থাৎ বাস্তব প্রতীক নিয়ে যেমন মিছিল করা যায় তেমনি এর চিকা মারা বা দেয়াল লিখন সহজ। এই সঙ্গে ছাতা ব্যবসায়ীদের টু পাইস লাভ হতো। কিন্তু কোনো এক অজ্ঞাত কারণে বাংলাদেশের কোনো রাজনৈতিক দলেরই প্রতীক ছাতা নয়। ছাতা জোটে স্বতন্ত্র প্রার্থীর ভাগ্যে। ছাতা যেন নিঃসঙ্গতার সঙ্গী।

উপহার ও ছাতা

আমাদের দেশে বিয়ে, জন্মদিন কিংবা কোনো উৎসবে ছাতা উপহার দেয়া হয় না। শুধু চাকরি থেকে অবসর নেয়ার প্রাক্কালে ফেয়ারওয়েল অনুষ্ঠানে কোরআন শরিফ, জায়নামাজের সঙ্গে ছাতা উপহার দেয়া হয়। অবসর জীবনে বৃষ্টিতে বাইরে বের হওয়া একান্ত প্রয়োজনীয় না হলেও কোনো এক অজ্ঞাত

কারণে ফেয়ারওয়েলে ছাতা উপহার দেয়া হয়। হয়তো অবসর জীবনের নিঃসঙ্গতার সঙ্গী হিসেবেই ছাতা উপহার দেয়া হয়।

বিজ্ঞান ও ছাতা

বলা হয়ে থাকে যোগাযোগের ক্ষেত্রে বিজ্ঞানের বিশেষ আবিষ্কারগুলো যেমন মোটর গাড়ি, ট্রেন, উড়োজাহাজ, টেলিফোন, ফ্যাক্স, ই–মেইল, কৃত্রিম উপগ্রহ ইত্যাদি দূরকে করেছে আপন। অচেনাকে করেছে চেনা। আর ছাতা বৃষ্টিতে একজন অপরিচিতকে করতে পারে পরিচিত। দুজনকে করতে পারে কাছাকাছি। তাই প্রেমিক–প্রেমিকাদের কাছে ছাতা রিকশার মতোই প্রিয়।

প্রতিবাদী ছাতা

গরমের সময় ইংল্যান্ডের তথা লন্ডনের আবহাওয়া থাকে বৃষ্টিস্নাত। বৃষ্টি শুরু হলে আর থামতে চায় না। ফলে ইংল্যান্ডে টেন্ট এবং উইম্বলডন টেনিসের খেলা পণ্ড হয়। তাই ইংরেজদের কাছে বিবিসি ওয়ার্ল্ড সার্ভিসের আবহাওয়ার ভবিষ্যৎবাণী গুরুত্বপূর্ণ। একবার বিবিসি ওয়ার্ল্ড সার্ভিসে এ বলা হলো, পরদিন লন্ডনে বৃষ্টি হবে। কিন্তু দেখা গেল, পরদিন লন্ডনের আকাশ মেঘমুক্ত। এ জন্য কোনো কোনো শহরবাসী বিবিসি–কে লজ্জা দেয়ার জন্য মেঘমুক্ত আবহাওয়ায় মাথার উপরে ছাতা ধরেছিল।
ঢাকা ইউনিভার্সিটি থেকে

পিপড়ার মাটি

আতর আলী মাঠা

ছেলেবেলার কথা মনে হলে এখনো নিভৃতে হেসে উঠি। এবং এই নীরব হাসির মাঝেই কেমন যেন একটা সুখ, কেমন যেন একটা দুঃখ ছুয়ে যায়।

বিল্লু আর আমার বিরুদ্ধেই গ্রামের সবার অভিযোগ। এর জন্য দরবার সালিশ থেকে আরম্ভ করে বাবা–মা, এমনকি পণ্ডিত স্যারের কাছেও মার খেয়েছি।

আমি কোনো সময়ই শয়তানির ছক একে বসে থাকতাম না। লেখাপড়াটা নিয়েই ব্যস্ত থাকতাম। দোষ করতো বিল্লু আর শাস্তি ভোগ করতাম দুজনেই। তার শয়তানির ধরন ছিল আজগুবি ধরনের।

পণ্ডিত স্যার মানে আমাদের নগেন স্যার। মাথায় একশ চুল হবে কি না সন্দেহ। পাকা গোফগুলো বেকিয়ে মহিষের শিংয়ের মতো রূপ ধরেছে। শুনেছি প্রতি মাসে দেড় সের করে ঘি খেয়ে এবং শরীরে

মেখেও হাড়গুলো ঢাকতে পারেনি। ধুতি আর নাগরা পায়ে ভালো মানাতো। বগলে ছাতা নিয়ে ক্লাসে ঢোকা ছিল তার নিত্যদিনের অভ্যাস। স্কেল ছাড়াই রেখা টানতেন এবং কম্পাস ছাড়াই বৃত্ত আকতেন। যে কোনো ধরনের অংক নিজেই তৈরি করে তার ফল মুখেই বলে দিতেন। গতকাল আমি আর বিল্লু এক বড় ধরনের শাস্তি ভোগ করেছি। তাই পণ্ডিত স্যারের ক্লাস ধরতে দেরি হয়ে গেল। সেদিন আবার সকাল থেকেই হঠাৎ করে মুষলধারে বৃষ্টি। এক ছাতার নিচে দুইজনে স্কুলে পৌছালাম। স্যারকে (ভয়ে ভয়ে) বললাম, স্যা...র...আ...আমি।

চশমার ফাক দিয়ে আমাদের দিকে তাকিয়ে স্যার গম্ভীর স্বরে বললেন, আসো গাধার বাচ্চারা। ভয়ে আর ছাতা মোড়ানোর কথা মনে ছিল না। স্যার বললেন, এই বিল্লু, এদিকে আয়।

আমি দাড়িয়ে আছি।

এই গাধা, ছাতা বন্ধ করিসনি কেন। বলেই শপাং শপাং দুটো কাচা বেতের বাড়ি তার পাছার মধ্যে বসিয়ে দিলেন।

বিল্লু তো দুইবাড়িতেই কুপোকাত। কেইড়া মাতব্বরের আদেশে সাতবার কান ধরে উঠা–বসা এবং জিকার ডালের পাচটি বাড়ি খেয়ে আমার শরীর ব্যথায় টেও টেও করছে, বিল্লুর তো কথাই নেই। সে খেয়েছে দশ বাড়ি। তার উপর আজ দুই বাড়ি।

পেছনে বসে বিল্লুকে বললাম, কেমন লাগলো?

বিল্লু বললো, মোটেই লাগেনি।

লাগেনি মানে?

পকেটে বেশি করে কাগজ রেখেছিলাম।

ফিক করে হাসতেই স্যার বললো, মাঠা, হাসলি কেন রে, দাড়া!

ভয়ে জড়সড়ো হয়ে দাড়ালাম।

স্যার কাছে এসেই বেত উচিয়ে বললেন, এই গোবর্ধন হাসলি কেন?

স্যার, আপনার মাথায় কাকে...।

স্যার মাথায় হাত দিয়ে এ্যা করে উঠলেন।

স্যার চলে গেলেন। বিল্লুর জিদ হলো, স্যার ছাতার জন্য তাকে বেত্রাঘাত করলেন! এর একটা বিহিত করবে। বিল্লু চুপিসারে স্যারের ছাতার ভেতর পিপড়ার মাটি রেখে দিয়ে স্কুলের পেছনে আম গাছের ডালে বসে তামাক খাচ্ছে। আমিও খাচ্ছি আর দেখছি স্যারের কি হয়। কিছুক্ষণ পর যখন দেখলাম,

পণ্ডিতমশায় ছাতা মেলতে গিয়ে সমস্ত পিপড়ার মাটি তার শরীরে পড়ছে এবং পিপড়ার কামড়ে নড়ে চড়ে উঠছেন তখন আমরা তামাক খাওয়া বাদ দিয়ে গাছ থেকে হাসতে হাসতে নেমে পড়লাম।

নাটোর থেকে

মা

তরুণ বড়ুয়া

মাঘ মাস। রৌদ্র উজ্জ্বল হিমেল সকাল। ইপিআই কেন্দ্রে টিকাদান কাজ পরিদর্শনে যেতে হবে। চান্দের গাড়িতে প্রায় বিশ কিলোমিটার। এরপর বাকখালী নদী পেরিয়ে আরো প্রায় তিন চার কিলোমিটার হাটা পথ।

চান্দের গাড়ি হলো, এক ধরনের জিপ। অনেকদিন চলার পর যখন অকেজো হয়ে পড়ে তখন চূড়ান্ত অকেজো ঘোষণার আগে এই রোডে কিছুদিন চলে। কোনোটার পাটাতন ফুটো আবার কোনোটার ছাদ ফুটো। কোনো কোনো জিপের পাটাতনের ফুটো দিয়ে দেখা যায় রশি দিয়ে বাধা গাড়ির কোনো যন্ত্রাংশ।

নদী পেরিয়ে সবুজ ছাতা মাথায় চলছি। পায়ে হাটা পথের দুই ধারে বিস্তর মাঠ। কোনো কোনো মাঠে সবজি ক্ষেত, মাঠের কোনো অংশে বীজতলা এবং ইরি ধান বোনার প্রস্তুতি। মাঝে মাঝে মাথার ওপর দিয়ে উড়ে চলে যায় সবুজ টিয়ের ঝাক। এ মনোরম দৃশ্য হাটার ক্লান্তি ভুলিয়ে দেয়। এর মধ্যে হঠাৎ শুনতে পেলাম শিশুর কান্না। দেখলাম মাঠে ধানের বীজতলায় এক মহিলা ধানের চারা তুলছে আর পাশেই ছাতার নিচে পাটিতে শুয়ে আছে ছয়–সাত মাস বয়সের ক্রন্দনরত এক শিশু।

মহিলার কোনো প্রতিক্রিয়া না দেখে দাড়ালাম। বললাম, বাচ্চাটা যে কাদছে?

মহিলা বললে, কাদুক, কাদতে কাদতে নিজ থেকেই থেমে যাবে।

মহিলাকে আমি চিনি এবং তিনিও আমাকে জানেন যে আমি স্বাস্থ্যকর্মী। আমি আবার বললাম, বাচ্চাটার বোধহয় ক্ষিধে পেয়েছে।

মহিলা কাজ থামিয়ে এক বিশেষ ভঙ্গিতে আমার দিকে তাকালেন। বললেন, তার ক্ষিধে পেয়েছে তো আমাকে কি করতে হবে? একবেলা খেলে দুবেলা উপোস করি। তাই বাচ্চাটা বুকের দুধ পায় না। জানেন এ চারাগুলো তুলে দেয়ার জন্য ষাট টাকায় ঠিকে নিয়েছি। অথচ একই কাজের জন্য পুরুষ লোক হলে পেত একশ টাকা। বাচ্চার বাপকে কাজটা নিতে বলেছিলাম। সে কাজ করবে না। দিনে ঘুমায় আর আমার কামাই করা টাকা কেড়ে নিয়ে রাতে মদ গেলে। কিন্তু সে কাজটা নিলে ৪০ টাকা বেশি পেতো। এসব বলতে বলতে মহিলা কেদে ফেলল।

মহিলাকে সমবেদনা জানিয়ে গন্তব্যে পা বাড়ালাম। ভাবলাম নারী–পুরুষের মজুরির বৈষম্যের কথা। দুই পা বাড়তেই বাচ্চাটা বিশেষ এক আওয়াজ করে কান্না থামালো। পেছন ফিরে তাকালাম। দেখলাম, বাচ্চাকে কোলে নিয়ে মা বসেছে। চোখাচোখি হতেই মহিলা নিজেকে ও বাচ্চাকে ছাতার আড়াল করলো।

প্রকৃতি সত্যিই সুন্দর। জিজ্ঞাসা করলাম, বাচ্চাকে সব টিকা দিয়েছেন কি?

ছাতার আড়াল থেকেই মহিলা উত্তর দিলেন, হামের টিকা ছাড়া সব টিকা দেয়া হয়েছে। বাকিটা নয় মাস পার হলেই দেবে।

মহিলার প্রথম কথায় আমি রাগ করেছি কি না জিজ্ঞাসা করলে বললাম, না।

রামু, চট্টগ্রাম থেকে

সমাধি

সুরমী সিদ্দিক

ঝমঝম শব্দে বৃষ্টি হচ্ছে। উদাস হয়ে রবীন্দ্রসঙ্গীত শুনছি। আর মনের মধ্যে চলছে স্মৃতির মিছিল। টুকরো টুকরো স্মৃতিগুলো জড়ো করে মনের ক্যানভাসে ছবি আকতে থাকি।

বাবার চাকরির সুবাদে সরকারি কোয়ার্টারে থাকতাম। বৃষ্টি হলে উঠানে পানি জমতো। সেই পানিতে কাগজের নৌকা বানিয়ে ভাসানোর মজাই ছিল অন্য রকম। বাবা আমাদের দুই ভাইবোনকে লাল, সবুজ আর হলুদ রঙ করা ছাতা কিনে দিয়েছিলেন। সেই প্রথম নিজস্ব ছাতার মালিক হওয়ার আনন্দে আমরা আত্মহারা হয়ে গিয়েছিলাম। বিচিত্র সেই ছাতা মেলে কারণে অকারণে বৃষ্টিতে নেমে যেতাম। তখন ছাতা ছিল বৃষ্টির দিলে মজার খেলনা। কি সরল এবং উচ্ছল ছিল দিনগুলো।

রোদ বৃষ্টিতে ছাতার সঙ্গ নিয়েছি প্রয়োজনের তাগিদে। শৈশব, কৈশোরে ছাতাকে আর দশটা প্রয়োজনের সামগ্রীই মনে করেছি।

এরপর মনে এলো দখিনা হাওয়ার ঝাপটা। লাল টিপ আর বেনারসিতে নতুন পরিবেশে এসে নতুন জীবনের আস্বাদ পেলাম। নতুন মানুষ পেলাম। পতিদেবতাকে বললাম, চল দুজনে মিলে একটু বৃষ্টিতে ভিজি।

অবাক হয়ে সে বললো, পাগল নাকি? ঠাণ্ডা লেগে জ্বর আসবে।

একটু থেমে বললাম, চলো তাহলে ছাতা মাথায় দিয়ে বেড়িয়ে আসি।

এবার আমার বাস্তববাদী স্বামী কুচকানো ভ্রু আরো কুচকে বললো, যতোসব ছেলেমানুষি। এখন তোমার বিয়ে হয়েছে বুঝে-শুনে চলো।

ব্যাস, আমার ইচ্ছাটার এখানেই সমাধি।

বগুড়া থেকে

মধ্যবিত্ত

আলাউল কবীর লিপটন

এদিক সেদিক তাকিয়ে নিলাম। ভয়ে সন্তর্পণে ঘরে প্রবেশ করেই দীর্ঘশ্বাস ফেললাম, যাক বাবা, বাচা গেল, মা ঘুমিয়ে। অনেকদিন পর শেষ বিকেলে মাকে ঘুমাতে দেখলাম। দিনভর শুধু কাজ আর কাজ এ নিয়েই থাকেন তিনি।

তখন ক্লাস ফাইভে পড়ি। স্কুল শেষে বাড়ি ফেরা। বইগুলো টেবিলে রাখতেই মা বললেন, কখন ফিরলি খোকা?

বুঝলাম ক্লান্ত শরীরে ঘুমের ভান করে শুয়ে ছিলেন তিনি। উত্তর দিতে পারিনি। মন খুব খারাপ হয়ে আছে। কোনো অপরাধ করে মায়ের চোখে তাকাতে পারতাম না কোনোদিন। আজ তাকালাম। তবু অশ্রু টলমল করছিল। চোখের পাতা অনড় থাকায় ঝরে পড়েনি। শত কান্নার পর কাল বাবা যে ছাতাটা আমার জন্য নিয়ে এসেছিলেন তা যে কোথায় ফেলে এসেছি মনে নেই।

মা আবার জিজ্ঞাসা করলেন এই কি করেছিস? অমন ড্যাব ড্যাব করে চেয়ে আছিস যে! কি হলো, কথা বলছিস না কেন?

নিরুত্তর। কোথাও না তাকিয়ে মাকে জড়িয়ে ধরে একেবারে কেদেই ফেললাম। হুড়মুড় করে বলে দিলাম সব।

মায়ের জেদটা তখন বাবার ওপর দিয়েই এক ঝটকা বয়ে গেল। বলেছিলাম, ছোট বাচ্চা, ছাতা-টাতা দিও না। হারিয়ে ফেলবে। তার উপর এতো দাম, অসহ্য! আমার আর ভালো লাগে না এসব। আরো কতো কি?

অবশ্য মধ্যবিত্ত পরিবারগুলো এভাবেই টানাপোড়েনে কষ্ট পায়। না হলে সামান্য একটা ছাতা...।

খুলনা থেকে

টোকিও লাভ স্টোরি

== নীলিমা

আজকের আবহাওয়া বেশি ভালো না। কেমন গুমোট ভাব। মনটাও ভালো নেই। গত দিনের কথা ভেবে নিজেকে খুব অপরাধী মনে হচ্ছে। উচিত হয়নি তাকে এতোটা দুঃখ দেয়া। কি করবো, আল্লাহর ইচ্ছায় ঠোটকাটা হয়ে জন্মেছি। কে কতোটুকু কষ্ট পেল তা না ভেবেই মন্তব্য করি।

বলা হয়নি কতোটুকু ভালোবাসি। অথচ ১৫ বছর ধরে সংসার করছি। তাকে এখন খুব ফিল করছি। কি নিয়ে কথা বলবো ভেবে পাচ্ছি না, প্রভুর কাছে প্রার্থনা করলাম ব্যবস্থা করো।

হঠাৎ করেই শ্রাবণের আকাশে মেঘ ডাকা শুরু হলো। এবং মুষলধারে বৃষ্টি যা আমার ইচ্ছা পূরণে সাহায্য করলো। তার বাড়ি ফেরার সময়। অথচ ছাতা নিয়ে যায়নি।

মোবাইলে ফোন করলাম। তুমি বাড়ি ফিরবে কিভাবে, আমি তোমার জন্য ছাতা নিয়ে বাসস্ট্যান্ডে আসবো?

সে বললো, এসো।

বাইরে প্রচণ্ড বাতাস, মুষলধারে বৃষ্টি ও বজ্রপাত। আমি রেইন কোট ও বুট পরে ছাতা নিয়ে বের হলাম।

প্রচণ্ড বাতাসে ছাতা উড়ে যেতে চাচ্ছে। দশ মিনিট হেটে গিয়ে বাসস্ট্যান্ডে অপেক্ষা করছি। আমার মতো আরো কয়েকজন ছাতা নিয়ে আগন্তুকের অপেক্ষায়।

কয়েকটি বাস এসে চলে গেল, সে এলো না। আমার অপরাধী চোখ তাকে খুজছে। প্রায় চল্লিশ মিনিটের মাথায় তার দেখা মিললো। একই ছাতার নিচে আমরা বাড়ি ফিরলাম ভিজতে ভিজতে।

সে মন্তব্য করলো, টোকিও লাভ স্টোরি।

টোকিও, জাপান থেকে